নাগালের বাইরে

নাগালের বাইরে

অজিত হাজরা

অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ আগস্ট প্রকাশক হীরক রায় অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল) কলিকাতা-৭৩ মুদ্রাকর: নিতাই চন্দ্র জানা জয়তারা প্রেস, কলিকাতা-৭০০০০৬, প্রচ্ছদ

সবিনয় নিবেদন

মানুষের করতালেই ধরা আছে তার পাপ পূণ্য। তথাপি জীবনের জীবনের পিছল পথে অনেকের পা পড়ে—অনেকে অনেক কাদাপথ পার হয়ে মসৃণ জীবনেও ফিরে আসে। জীবনের বিড়ম্বনা যেমন কেউ চান না তেমনি সাফল্যের আকাঙ্খাও সব সময় সফল হয় না। এই কাহিনীতে তেমনি কিছু পাত্র-পাত্রীর আশা-নিরাশা, আশা ভঙ্গ, সাফল্যে উত্তরণের অন্তরঙ্গ কথা বলা হয়েছে।

১

মিশন রোডের হলুদ রংয়ের বাড়িটার দোর গোড়ায় দীপংকর থমকে দাঁড়াল—এই তোমার অফিস!

মেহগিনি পালিশ করা দরজার ডান পাশে নেমপ্লেট সোনার মত চকচক করে। স্বাতী কয়েক পলক দেখল, তারপর ঠোঁট নেড়ে পড়ে—নিউ ইণ্ডিয়া ইকুইপমেন্ট লিমিটেড।

দীপংকর হাসল। হাসিটা স্বাতীর মাথার ওপর। ভদ্রলোক বেশ লম্বা। টিকলো নাক, এক মাথা কোঁকড়া চুল আর ঝকঝকে হাসি নিয়ে বত্রিশ বছরের যুবক।

স্বাতীকে কেউ যদি সুন্দরী মনে করে করতে পারে আর—যদি কেউ তা না মনে করে কিছু বলার নেই। গায়ের রঙ অবিশ্যিই ফর্সা, তবে দুধে আলতা নয়। গড়নটি ছিপছিপে। চোখ টানা—টানা কিন্তু ঝিকমিক করে না। কারণ, সুখের ঘরে আগুন লেগেছে। তাই দীপংকরের সঙ্গে চাকরী খুঁজতে আসা।

দীপংকর মুখের হাসিটুকু মুখে রেখেই বলল—দেখছ কী; ভেতরে চল।

চমকে উঠল স্বাতী। আঁচলটা খসে যাচ্ছিল ধরে ফেলল। মনে পড়ে, বাড়ি থেকে বেরবার সময় জয়ন্ত মানে ওর স্বামী বলেছিল—চাকরী করতে যেও না।

।অফিস টাইম। মারবেল পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে অসিফ ঢুকছে সাদা কলার। একুশ বাইশ থেকে উনষাট ষাট বয়েসের নারী পুরুষ। জীবন সংগ্রামে রত। দীর্ঘ তিরিশ বছর এই সংগ্রামকাল।

মানুষ জনের ভিড় বাঁচিয়ে কালো টাই পরা মাঝ বয়েসী একজন গভীর অন্যমনস্কতায় লিফ্‌ট থেকে নামল। চাপরাসী তুখোড় সেলাম দিল ডান হাতে।

দীপংকর ডোবা গলায় স্বাতীকে বলে—প্রোডাকশন ম্যানেজার।

—এঁর সঙ্গেই তোমার জানা শোনা?

—হ্যাঁ। দীপংকর এক পলক ভেবে বলল—দেখতে পায়নি আমাকে।

স্বাতী প্রত্যয় পেল না। সামনে দিয়ে চলে গেল আর দেখতে পেল না! তা কী হয়? দেখেছে ঠিকই, কথা বলল না। জানা শোনা হলেও সমান সমান তো নয়। মহারথী আর পদাতিক। ব্যবধান কয়েক যোজন। স্বাতী মুখ তুলে দীপংকরের দিকে তাকাল। ও কোন কথা না বললেও দীপংকর বুঝতে পারে। বলল, কৃষ্ণ হেন সখা যার কিসের অভাব তার। ঘাবড়াচ্ছ কেন?

—সে কী তুমি জানো না?

—জানি। চাকরী তোমার করে দেবই। এখানে না হয় আর কোনখানে।

—কলকাতাতেই তো?

—হ্যাঁ। কলকাতায়।

দীপংকর আঙ্গুল জড়িয়ে স্বাতীর হাত ধরল। বন্ধুর মত দু'জন হাঁটে।

মেয়ে পুরুষের ঘনিষ্ঠতা মানুষজন চোখের কোণে দেখছে। ছবিই দৃষ্টি কাড়ে, তা এতো রক্ত মাংসের ব্যাপার। স্বাতী অস্বস্তি

বোধ করলেও হাত টেনে নিল না। যদি দীপংকর রাগ করে তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। চাকরী হবে না। স্বামীর ফ্ল্যাট আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে সারাজীবন।

সাজানো ঘর। কার্পেট পরদা ফ্লাওয়ারভাস, দেয়ালে ফ্যাক্টরির বার্ডস আই ভিউ ছবি। ঠিক তার নীচে সুইভেল চেয়ারে প্রোডাকশন ম্যানেজার রাজেশ কাপুর। চোখে ভারী শেলের স্টীল-গ্রে চশমা। বিশাল টেবিলের ওপর ছড়ানো ব্লু-প্রিন্ট থেকে মুখ না তুলেই বলল, বসুন।

দীপংকর চেয়ার টেনে স্বাতীকে বসতে ইঙ্গিত করল। স্বাতী বসলে দীপংকরও বসল। এক মিনিট পর রাজেশ মুখ তোলে।

—দীপংকর বাবু যে। কী খবর?

—ভাল। দীপংকর স্বাতীর দিকে মুখ ফেরাল—এঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম। মিসেস স্বাতী রায়।

স্বাতী হাত দুটো জড় করে মাথার দিকে তুললে রাজেশ নড করল। কাজের মানুষ ব্যস্ত থাকলে যেমন করে। পাইপ কামড়ে বলল, আপনার টাইপিং জানা আছে। তাই না?

—হাঁ।

—কত স্পীড?

—ফরটি ফাইভ।

—নট ব্যাড। রাজেশ একটা টাইপ করা কাগজ স্বাতীর দিকে এগিয়ে দিল—সাড়ে চারশো ওয়ার্ড। দশ মিনিটে টাইপ করতে হবে। পারবেন?

—চেষ্টা করে দেখি।

—দেখুন। রাজেশ তার ঘরের লম্বা দিকে দাঁড় করানো স্ক্রীনের দিকে তাকাল—ওপাশে মেশিন কাগজ সবই আছে।

স্বাতী উঠে দাঁড়িয়ে দীপংকরের দিকে তাকায়। ও হাতের অভয় মুদ্রা করল। ভয় নেই।

স্বাতী টাইপ করতে সুরু করলে রাজেশ ঘড়ি দেখল। তারপর গভীর গলায় বলে—দীপংকর বাবু, আপনাদের আমরা আর টেণ্ডার দেব না।

—কেন? দেবেন না কেন?

—দেওয়া উচিত নয়।

এ কথায় দীপংকর মুখ কাঁচু মাঁচু করে। উপকারী ব্যক্তির বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা দেখলে লোকে যেমন করে তেমনি। রাজেশ গভীরতর গলায় বলল—য়ুওর পারচেজ অফিসার বসাক স্যুড নো উই হাভ আ গুড উইল ইন দা মারকেট। আমরা জিনিস খারাপ দি?

—না। নিউ ইণ্ডিয়া টু দা স্পেসিফিকেশন মেশিনারী সাপ্লাই করে।

—তাহলে? তাহলে পাঁচ পার্সেণ্ট কোথা থেকে দেব?

—আমি বসাকদাকে বুঝিয়ে বলব।

—বৃথা। রাজেশ ম্লান হাসল—পারকিনসন কী এমনি এমনি সাব অর্ডিনেটদের জ্ঞান দিতে মানা করেছেন? ভদ্রলোক সরকারী অফিসারদের হাড়ে হাড়ে চিনতেন। আপনি বোঝাবার চেষ্টা করলে আপনাদের আঁতাত ভেঙ্গে যাবে।

—যায় তো যাবে।

রাজেশ হাসল। হেসে বলল—দীপংকরবাবু এটা আপনার মনের কথা না।

ব্যঙ্গের কথাটা দীপংকর গিলে খায়।

*

স্বাতীর টাইপ করা কাগজটা রাজেশ খুঁটিয়ে দেখছে। মাত্র এক

পার্সেন্ট ভুল। সময় দেখে হিসেব করল। মিনিটে পঞ্চাশ। মুখ তুলে চোখ রাখে স্বাতীর বিষণ্ণ চোখে।

রাজেশ চেষ্টা করল মনে করতে যা দীপংকর বলেছিল স্বাতীর সম্বন্ধে। শুধু একটা কথাই মনে পড়ে। অসুখী। কারণটা ঠিক মনে পড়ে না। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই বা হচ্ছে না এরকম কিছু। চোখ নামিয়ে নিল।

স্বাতী দাঁড়িয়ে রয়েছে আদেশের অপেক্ষায়। বাঁ কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো। বুকের ভেতর আবহাওয়া বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের মত থম মেরে আছে। ঠোঁট সামান্য কাঁপল। রাজেশ বুঝতে পারে প্রার্থিনী কিছু বলতে চায়। ও হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে ডায়াল করল।

টেলিফোনের সংলাপ শুনে স্বাতীর বুঝতে বাকী থাকে না। নিউ ইণ্ডিয়ায় স্থান পেয়েছে। বুকের আলোড়ন থামল। রাজেশ রিসিভার নামিয়ে দিল। স্বাতী বলে, অশেষ ধন্যবাদ। চাপরাশী এল নিঃশব্দে। রাজেশ বলল—ভগীরথ, এঁকে টাইপ সেকশনে নিয়ে যাও।

বলে স্বাতীর দিকে তাকাল--অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার আজ না হলে কাল পেয়ে যাবেন। মন দিয়ে কাজকর্ম করবেন। কেমন?

স্বাতী মাথা হেলিয়ে দিল। করবে।

বেরিয়ে এসে স্বাতী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চাকরী পেয়েছে বলে শুধু নয়, ওর অস্বস্তি লাগছিল তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে। আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব হলে এককথা। অপরিচিত পুরুষের সামনে, তাও আবার তার অনুগ্রহের আশায়, ভিখিরীর মতন দাঁড়িয়ে থাকতে কোন মেয়ের না অস্বস্তি হয়।

ভগীরথ সামনে স্বাতী পেছনে। নবাগতা পা ফেলছে আর ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। ড্রইং, সেলস, স্টাফ অ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেণ্ট। দেখতে দেখতে স্বাতী স্মৃতির গভীর গহনে তলিয়ে যায়।

স্বাতী একবার জয়ন্তর সঙ্গে আলিপুরে কোন শিল্পপতির বাড়ি গিয়েছিল। বিশাল বাড়ি। এই রকম প্যাসেজের দুদিকে কামরা। জয়ন্ত বলছিল—এটা স্টাডি এটা টয়রেম এটা ব্যাঙ্কোয়েট। এক এক ঘরে এক এক কারবার।

ভগীরথ মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে স্বাতী বলে—তোমাদের অফিসে লাইব্রেরী নেই?

ভগীরথ জবাব দিল—আছে দিদিমণি।

স্বাতী চমকে উঠল। দিদিমণি!

জয়েনিং রিপোর্ট লেখা হলে স্বাতী চোখ তুলে তাকাল। বড়বাবুর মুখের অভিব্যক্তি এমনই যেন তাঁকে কোন অসাধারণ মহানায়কের ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির মত দেখায়।

টাইপ সেক্‌শনের তেমন জেল্লা নেই। রংচটা টেবিল চেয়ার, হাড় জিরজিরে টাইপ রাইটার। সাতজন টাইপিস্ট ও একজন হেড ক্লার্কের পক্ষে কামরাটা ছোটই। আর এ ঘরে রাজেশের চেম্বারের মতন সাজুগুজু নেই।

চকিতে স্বাতীর স্ক্রীনের আড়ালে জায়গাটুকু মনে পড়ল কেমন নিরিবিলি, কেমন ছিমছাম। মনটা খারাপ হয়ে যায়। এই ঘরে বসতে হবে।

এক মাথা কাঁচাপাকা চুল নিয়ে টাইপিং সেক্‌শনের বড়বাবু নিবারণ চক্রবর্তী। স্বাতীকে বললেন—আপনিই মিসেস স্বাতী রায়!

—হাঁ।

—এর আগে কোন অফিসে ছিলেন?

—এই প্রথম।

—বুঝেছি। বড়বাবু ছোট করে হাসলেন।

স্বাতী লজ্জা পেল। কী বুঝেছেন? কোন মেয়ে একটু বেশী বয়েসে চাকরী করতে এলে কী বোঝা যায়?

নিবারণবাবু বললেন—বেটার লেট ছান নেভার। ঠিক আছে। একটা জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে দিন।

না জানা থাকলে অত্যন্ত সহজ কাজও কঠিন। স্বাতী কাগজ নিল, কলম নিল, কিন্তু লিখতে পারে না। নাকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। রুমালে মুখ মুছে বলল—কী লিখব?

—লিখুন। টু দা জেনারেল ম্যানেজার। স্বাতী লিখতে উদ্যত হয়েছে, নিবারণ সন্দেহের চোখে তাকালেন।

—কী কালি?

—সবুজ।

—চলবে না। নিবারণ নিজের কলমটা দিলেন। সাদা কাগজ কালো কালি। অফিসে রংয়ের কারবার নেই। না থাকাটাই ভাল। কী বলুন?

স্বাতী হাঁও বলতে পারে না, নাও বলতে পারে না।

*

স্বাতীর জন্যে চেয়ার টেবিল রয়েছে, কিন্তু মেশিন নেই। টাইপিস্ট তিতির স্টেনো হলে নিজের মেশিনটা নিয়ে যায়। নিবারণ টাইপ রাইটার জোগাড় করার কথা ভাবতে লাগলেন।

স্বাতী কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে এল করিডরে। কুলারের জল খেল। এক পা দু'পা করে হাঁটে আর ভাবে। নিজের রোজগার না থাকলে বড় ছোট হতে হয়। কেউ গ্রাহ্যিই করে না। কেন করবে? জানে তো মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। হাঁটি হাঁটি করে করিডরের শেষ প্রান্তে পৌঁছল। সেখানে একটা জানালা। সেটা দিয়ে বাইরে তাকাতেই অবাক। কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথা লালে লাল।

চোখে রঙের নেশা লাগে স্বাতীর। সিঁদুরের মত লাল। তারি সঙ্গে হলুদের ছিট। কোথাও গাঢ় কোথাও ফিকে। এমন একটা গাছ এই অফিস পাড়ায়, যেখানে রংএর কোন কারবার নেই। ও আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

—স্বাতীদি।

স্বাতী চমকে উঠল। আবার দিদি। এমন হলে কেউ বাঁচে? স্বাতী ঘুরে দাঁড়াল। মনের প্রসন্নতাটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। বলল—আমাকে ডাকছেন?

—হাঁ। অভ্র ঠোঁট ছড়াল—আমাকে চিনতে পারছেন না?

স্বাতীর কাজললতা চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপে।

অভ্রকুমার বলল—আমি জয়ন্তদার ফ্যান। সেই যে মোহন বাগান মাঠে লীগের খেলা। কাউণ্টারে টিকেট বিক্রী বন্ধ। আপনি আমাকে একটা ডে'শ্লিপ দিয়েছিলেন।

—ওহো! আপনি যতীন কলোনীর ছেলে। ফুটবলার। স্বাতী কান এঁটো করে হাসল।

—আমাকে আপনি করে কথা বলছেন কেন?

—তা কী হয়েছে। আপনি তো আমার সীনিয়র।

অভ্রকুমার প্রবল ভাবে মাথা নাড়ে—তা কখনও হয়? আপনি হলেন আমার বৌদি। বৌদি কখনও জুনিয়র হয়?

বৌদি বৌদি বলায় স্বাতীর ভাল লাগল। বলে—তাই যদি হয় তাহলে স্বাতীদি বলে ডাকলে কেন?

অভ্রর ফরসা মুখে ছায়া পড়ে। বলল—অফিসে শুধু দা আর দি। অন্য সম্বন্ধ নেই।

*

সিলিংফ্যানটা মাথার ওপর না হওয়ায় হাওয়া কম। স্বাতী তার জামার নীচে আঙুল সেঁধিয়ে বাঁধন টাঁধনগুলো আলগা করে দিল।

বালক পিওন গোটা কয়েক ড্রাফ্‌ট রেখে গেল টেবিলে। নিবারণ তাঁর টেবিল থেকে বললেন—ফিগারের ঝামেলা নেই। সাদামাটা চিঠি। করে ফেলুন।

স্বাতী বিভিন্ন হাতের লেখার ওপর চোখ বোলাল। দু' একটা

শব্দ উদ্ধার করতে পারল না। অভ্রর কাছে জেনে নিল। তারপর কাগজ কার্বন মেসিনে লাগায়।

স্বাতীর এক পাশে অভ্র আর এক পাশে কাজল। কাজলের শরীরে মেদমাংসের অভাব, হাড়ের ওপর চামড়া। দেখলে মনে হয় বেশী দিন বাঁচবে না। কিন্তু এই রকম স্বাস্থ্য নিয়েও চার পাঁচবছর চাকরী করছে। কাজলের পাশে রেখাদি। ওঁর চাকরী অনেকদিনের। সিনিয়রমোস্ট টাইপিস্ট, সেক্‌সনের সকলের রেখাদি। এদিকে এই চারজন আর অপরদিকে মিনি শোভন তাপস আর সুলতা। মিনি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে, সাজ গোজ খুব। হালফিল ডিভোর্স করেছে। তাপস আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে নিউইণ্ডিয়ায় ঢুকেছিল দু'বছর আগে। ইচ্ছে ছিল শিল্প সংক্রান্ত চাকরী পেলেই ছেড়ে দেবে, এখন আর তা নেই। সুলতার মুখখানি কচি আবার সুন্দর। বিয়ের কথাবার্তা চলছে। হলে চাক্‌রী করবে না। শোভন আর কাজল প্রেমিক প্রেমিকা।

তা ওরা এখন ব্যস্ত। আউটটার্ণ স্লিপে অন্ততঃ দুহাজার শব্দ হওয়া চাই। এদিকে লাঞ্চ ইণ্টারভ্যালের আর মাত্র এক ঘণ্টা। সব কটা মেশিন আওয়াজ দিচ্ছে। তারি মধ্যে যতি ও বিরতির টুং টাং।

নিবারণের সংসার আজ যেন পরিপূর্ণ। একটা চেয়ার খালি ছিল তিন মাস। আজ সেটায় একজন বসেছে। তিনি স্বাতীকে দেখছেন, টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুললেন, দূরের মানুষের কথা শুনলেন, টেবিলে রিসিভার নামিয়ে বললেন—মিসেস রায়, আপনার টেলিফোন।

স্বাতী উঠে এল। কে ডাকছে? বোধ হয় পতি দেবতা। এতকাল তো বাসায় ফেরার চিন্তা ছিল না। বোতাম টিপলেই স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। জানতে চাইছে, ও কখন বাসায় ফিরবে। বুঝুক বাসায় একটা বউ থাকার কত সুবিধে। রিসিভার তুলল।

—হ্যালো।

—আমি দীপংকর।

—ও।

—কী হল?

—কিছু না।

—চাকরী কেমন লাগছে?

—ভাল।

—ছুটির পর কী করবে?

—বাসায় ফিরব। রাখি।

বলে রিসিভার রেখেই দিল।

স্বাতীর অস্বস্তি হচ্ছিল নিবারণকে সাক্ষী রেখে কথা বলতে। হয়ত এমন কিছু বলে ফেলবে যা ব্যক্তিগত। তখন বড়বাবু ওর জীবনে অনুপ্রবেশ করতে চাইবেন। সে বড় লজ্জার ব্যাপার।

নিজের চেয়ারে ফিরে স্বাতী গা এলিয়ে দিল। মনে পড়ছে সকালে জয়ন্তর সঙ্গে কথা কাটাকাটি। ও যখন অফিসে আসার জন্যে তৈরী হচ্ছে জয়ন্ত প্র্যাকটিস করার পর মাঠ থেকে ফিরল, মুখটা গোমড়া। বলে—দীপংকর তোমাকে চাকরী করে দিচ্ছে এমনি? বউ মরা শালাকে খুব চিনি। নাম্বার ওয়ান ফিলান—ডারার।

*

ছুটির পর দীপংকর দীঘির পাড়ে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে, স্বাতীর প্রতীক্ষায়। দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের ছাই বাড়ে। ট্রাম বাসে কাঁঠাল ঝোলা ভিড়, রাস্তা পারাপারের ডেথ ডেথ খেলা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক। সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা লাগল আঙুলে।

বড় রাস্তা পেরোতে স্বাতী এক পা এগোয় তো দুপা পেছোয়। মুখের ওপর বেলা শেষের রোদের ছটা, কানের লাল পাথর ঝিক্‌মিক্‌

করে। স্বাতীকে দেখতে পেয়ে দীপংকর শরীরটা যথা সম্ভব টান টান করে। মনে পূর্বরাগ উথলে উঠল।

আজি হতে দশবর্ষ পূর্বে ভবানীপুরের যে বাড়িতে দীপংকর থাকত তার মুখোমুখি বাড়িতে থাকত প্রথম ভালবাসার মেয়ে স্বাতী। 'জব গোধূলি বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি'। স্বাতী টাইপ শিখতে বেরোচ্ছে, আর দীপংকর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাম, গুণছে। এক, দুই, তিন—তিনটে হলেই এসে যেত স্বাতী। দীপংকর মুখ তুলে তাকাত। বলো বলো সখি তোমার কুশল বলো। স্বাতী অনর্গল কথা বলত। সে সময় যদি কোন বাস বা ট্যাক্সি বিপজ্জনক ভাবে কাছে আসত, দীপংকর হাত ধরত স্বাতীর। এভাবে যখনও তৈরী হচ্ছে মিলনের জন্যে তখন এক বিপর্যয়। সকলি গরল ভেল। দীপংকরের পরম বৈষ্ণব বাবা লীলাকীর্তন করতে করতেই খুন। ব্যাপারটা পুরবাসীজন ছ্যাখে নিরাপদ দূরত্ব থেকে। পরদিন বাসার দরজায় তালা পড়ল। দীপংকর বিধবা মায়ের হাত ধরে চলে যায় মামা বাড়ি। 'যাইতে পেখল নাহাইলি গোরী'। স্বাতী ডাক শুনে বাথরুমের দরজা ফাঁক করে। আর দীপংকর নাহাইলি গোরীকে দেখল। আহা! কিবা অপরূপ রূপ। দেখে আশা মেটে না। কাজেই কিছুদিন মামা বাড়ি থাকার পর ছটফট করে। চোখের সামনে সদাই স্বাতী, কিন্তু ধরা যায় না। মাস খানেক পর ফিরতে জয়ন্ত ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়। পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ছাতি ফুলিয়ে বলে—ভাগ, শালা এখান থেকে নাহলে তোর লাস ফেলে দেব।

দীপংকরের গায়ে তেমন জোর ছিল না, মনও বৈষ্ণবীয়। ও রুখে দাঁড়ায় নি। দিন কয়েক পর ভবানীপুরের বাসা ছেড়ে দেয়। কিন্তু রাই কিশোরীর জন্যে 'ফাটি যাও ত ছাতিয়া'।

যতীন কলোনীর মামাবাড়িতে থেকে দীপংকর টাইপ শেখে, বিয়ে

করে ও একটা চাকরী যোগাড় করে। এইসব করতে করতে মন বদলে যায়। এখন অন্য এক মানুষ।

*

স্বাতী কোন রকমে রাস্তা পেরিয়ে দীপংকরের পাড়ে উঠল। এদিকেই বাসস্ট্যাণ্ড। ইতি উতি তাকায়।

দীপংকর কদমতলা ছেড়ে ধীর পায়ে স্বাতীর কাছে এল—ভিড় বাসে উঠবে কী করে সই?

—যেমন করে আর পাঁচ জন উঠছে! স্বাতী আঙ্গুল তুলে দেখাল—ওই বাসটা বেশ ফাঁকা।

— ধরতে পারবে?

—খু উব। স্বাতী হাঁটে প্রায় ছোটার মতন। ভারী পেছনটার ওঠানামা দীপংকরের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে। ও পিছু নিল। স্বাতী মুখ ঘুরিয়ে বলে—তুমিও এস।

দীপংকর মাথা নাড়ল। স্বাতী যাবে নর্থে মানিকতলা আর ও সাউথে যতীন কলোনী। দুজনের বাস আলাদা। সেটা কিন্তু মাথা নাড়ার কারণ নয়।

দীপংকর এখন জয়ন্তর মুখোমুখি হতে চায় না। মনে মনে বলে খেলোয়াড় হারামজাদা। আটটি বছর স্বাতীকে বিয়ে করেছ। তবু স্বাতী আমারই। আর কটা মাস অপেক্ষা কর, দেখাবো আমার খেলা।

২

কাঁধে কিট ব্যাগ ঝোলানো সবল চেহারার একটা বছর চল্লিশের লোক। প্রসারিত কাঁধ, যেন সোলডার চার্জ করার জন্যে মুখিয়ে আছে। বিষণ্ণ মুখে লক্ষণীয় বস্তু ভুরু। এমন নির্লোম ভুরু সচরাচর দেখা যায় না। এই হল ফুটবলার জয়ন্ত রায়।

অফিস করে বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু বাড়ি ঢুকতে পারে নি। দুটো চাবি করানো হয়েছিল যাতে স্বামী স্ত্রী কারও অসুবিধে না হয়। জয়ন্ত ওরটা খুঁজে পাচ্ছে না। মেজাজ খাট্টা। অস্থির পায়ে চায়ের দোকান পর্যন্ত যাচ্ছে ফিরে আসছে। তাকাচ্ছে মুখ তুলে উটের মতন।

চা-অলা বলল—কী হল জয়ন্তদা?

—বউ চাকরী করলে যা হয়। দরজায় তালা ঝুলছে এত বড়।

—তো কী হয়েছে। ছোকরা উদারতা দেখায়—দোকানে এসে বসুন। চা খান। এসে যাবেন বৌদি।

কী করবে ভাবছে জয়ন্ত, স্বাতী উদয় হল। জয়ন্ত রুক্ষ গলায় বলে—বেশ যা হোক।

স্বাতী চাপা গলায় বলল—রাস্তায় চেঁচিয়ো না। চাবি হারিয়েছ কেন?

বলে বাড়ির দিকে এগোয়।

রাস্তার ওপর চারতলা বাড়ি। প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। জয়ন্তর ফ্ল্যাট মগডালে। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে এল ওরা। স্বাতী তালা খুলল। ঢুকতেই ডাইনিং স্পেশ। খাবার টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার রয়েছে।

দুজনেই বসল। বাসের ধকল কী সোজা? পুরো একটি ঘণ্টা স্ট্যাণ্ড আপ। তাও শান্তিতে নয়। কেউ ঠেলছে, কেউ চাপ দিচ্ছে, কেউ পা মাড়িয়ে দিচ্ছে। হাই তুলে জয়ন্ত বলল—আর ভাল লাগে না।

স্বাতী খাবার টেবিলে নামানো ব্যাগটা খুলছিল। মুখ তুলে জয়ন্তর দিকে তাকায়।

—ভাল কী আমারই লাগে।

—না লাগলে চাকরী করছ কেন?

—ভাল না লাগলেও মানুষ অনেক কিছু করে। করতে হয়। না করলে চলে না।

স্বাতী ব্যাগ থেকে চিঠি বের করল। দাদার চিঠি। পড়ল। জীবনের রাস্তায় পেছনে ফেলে আসা মুখগুলি যেন দেখতে পায়।

প্রথম মুখটা বাবার। ওরই মতন ইলিপটিক্যাল মুখ আর ওরই মতন বড় বড় চোখ। বাবা বিপুল এক গ্রন্থ লিখেছিলেন। বাদশাহী যুগের চাকরী করা মানুষদের নিয়ে। হাজ্জাম, ছিলমচি, নোকরাইন, বাবুর্চি, বাঈজী, খানসামা, কলমচি, হুকুমদার। গোলাম আর বাঁদী। বাধ্য অনুগত প্রতিবাদহীন। নেহাৎই খেয়ে পরে বেঁচে ছিল তারা। এইসব নরনারীর সাধ আহ্লাদ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা স্বাতী অনেক ভেবেছে। মনে পড়ল জিন্নৎকে। বড়ই আশ্চর্য এই বাঁদী। ভালবাসার পুরুষের জন্য বাঁদী সংসার ছেড়েছিল। তাও কেমন পুরুষ? সামান্য এক ফকির।

*

জয়ন্ত সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠল।

ডানদিকে বসবার ঘর, সামনে শোবার। দুঘরের দুটো দরজা খাবার জায়গার দিকে। শোবার ঘরের পাশে রান্না ঘর। বাঁদিকটা খোলা। পেছনে বাথরুম। সবই ডাইনিং স্পেশ ঘিরে। জয়ন্ত বসবার ঘরে ঢুকল।

স্বাতী বসেই থাকে। শরীরের ক্লান্তি নয়, মনটা কেমন ফাঁকা। এই যে এক ছাদের নীচে আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো রয়েছে ওরা, এর কোন মানে হয়? একে দাম্পত্য জীবন বলে?

অন্তরের ক্ষোভ কখন যে কী মনে করিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। সহসা স্বাতীর মনে পড়ল দু দুবার মা হতে গিয়েও মা হতে পারে নি।

প্রথমটা ইমম্যাচিওর ডেলিভারি। আট মাসে রক্ত ভেঙ্গেছিল। জয়ন্ত তখন টুর্নামেন্টের খেলায় আসানসোলে। নার্সিং হোমের লোহার খাটে শুয়ে স্বাতী প্রহর গোণে, জয়ন্তর দেখা নেই। শেষেরটা সিজারিয়ান অপারেশন। যখন স্বাতীর তলপেট কাটা ছেঁড়া সেলাই ফোঁড়াই হচ্ছিল তখন জয়ন্ত দিল্লীর মাঠে। ফিরে এসে বলেছিল—এমন বেয়াড়া সময়ে...

স্বাতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খেলা আগে বউ পরে। প্রসব ব্যথা উঠেছে জেনেও খেলতে গিয়েছিল। এই ওর স্বামী। চেয়ার থেকে উঠল বিরক্তি নিয়ে। শোবার ঘরে যায়। শাড়ীর আঁচলটা নামিয়ে আবার তুলে নিল কাঁধের ওপর। মনে হল ওঘরে যেন দুজন চাপা গলায় কথা বলছে। হাত বাড়িয়ে দু ঘরের মাঝের এক পাল্লা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জয়ন্ত চেঁচায়—বেশ হাওয়া আসছিল, বন্ধ করলে কেন? স্বাতীর বিরক্তি ধরে। শুধু নিজের চিন্তা। বলে—ফ্যান খুলে দাও।

জামা কাপড় ছাড়ছে স্বাতী। ঘামে ভিজে গিয়েছে সব। বাসের ধকল তো সোজা নয়। বুক চাপা ভিড়ে প্রায় এক ঘণ্টা। তাও এই গরমে। ম্যাক্সিটা গায়ে দিল। দরজা খুলে উঁকি মারে। এ কী! জয়ন্ত আপন মনে বিড়বিড় করছে। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

*

জয়ন্তর মাথা খারাপ হবারই জোগাড়। খেলা নিয়ে কত যে বিপত্তি। আজ নয়, সেই বাল্যকাল থেকেই।

বর্ধমান জেলার ব্রজপুর গাঁয়ে বাড়ি। জোতদার বাবার স্বনামে বেনামে আশীবিঘে জমি। ডিভিসির কেনালের জলে চাষ, বৃষ্টি না হলেও বিঘেয় সতেরো আঠারো মন ধান। চাষের চালের ভাত, ঘরের পুকুরের মাছ, বাগানের আম কাঁঠাল খেয়ে বালক জয়ন্তর হৃষ্টপুষ্ট শরীর ছিল। সারাদিন খেলে বেড়াত। একদিন ছোট বোনকে নিয়ে আমবাগানে ফুটবল খেলছিল, বিপত্তি। ও বল পায়ে নাচছিল, বোনকেও নাচাচ্ছিল। ঋতু হাঁফায়। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—দাদা, অত ড্রিবলিং করিসনে, আমি মরে যাব। জয়ন্ত চোখ সরু করে ঋতুর ব্যাকুল চাউনি হাঁ'করা মুখ ঘামেভেজা কপাল দেখল। দেখার পর কী এক নিষ্ঠুরতা ওকে পেয়ে বসে। বলটা শট করে বলে—দৌড়। ওই ভেরেণ্ডা ঝোপের ভেতর ঢুকেছে। নিয়ে আয়। ঋতু ঘাসের ওপর বসে পড়েছিল, টলতে টলতে ঝোপের দিকে এগোয়। ঝোপে ঢুকতে বিশাল এক কালকেউটে ছোবল মারে। কয়েক পলকের মধ্যেই শরীর নীল হয়ে যায়। ঋতুর শীতল শরীর ছুঁয়ে জয়ন্ত প্রতিজ্ঞা করে জীবনে ফুটবলে পা দেবে না।

বর্তমান বিপত্তিটা ঋতুর সর্পদংশন অথবা স্বাতীর প্রসব বিপর্যয়ের মত নয়। অন্যরকম। জয়ন্ত অফিসটিমে সিলেকটেড হয় নি। অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ তার। তাই অভিমানের গলায় বিড় বিড় করছে—আমি তো ফুটবল ত্যাগ করেছিলাম। কে আমাকে আবার ফুটবল ধরিয়েছিল? কে বলেছিল তোমার প্রতিভা আছে? কে বলেছিল তুমি কলকাতার মাঠে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারবে?

স্বাতী ফ্যানের নীচে বসে রয়েছে। জয়ন্তর বিড় বিড় শুনতে পায়। অমনি মন পিছু হটে আট দশ বছর। রেসকোর্সের সাদা বেড়ায় পিঠ দিয়ে স্বাতী দাঁড়িয়েছিল। ওর দাদা আর তার বন্ধুরা টিম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। একজন খেলোয়াড় কম। স্বাতী চেঁচিয়ে নক্ষত্রকে বলে—দাদা, দীপংকর বোধ হয় আসতে পারবে না।

মাসীমার শরীর খারাপ। তখন নক্ষত্র অতীন বীতশোক এরা কী করবে ভেবে পায় না। এদিকে বিপক্ষ দল তাড়া দেয়। ও চোখের ইসারায় দেখায় হৃষ্টপুষ্ট জয়ন্তকে! নক্ষত্র একজন খেলোয়াড়ের অভাবে খেলাটা মাটি হচ্ছে জানালে, জয়ন্ত অনেকক্ষণ মাথা নেড়েছিল। তখন ও মায়াবী গলায় বলেছিল, এত করে বলছে খেলুন না। আর কাজও হয়েছিল। জয়ন্ত অতিসূক্ষ্ম প্যাঁচপয়জার দেখালে ও বলেছিল, প্রতিভা, এস্টাবলিশ করা ইত্যাদি সুখকর কথা।

স্বাতীর এখন কান্না পায়। কেন বলতে গিয়েছিল ওসব?

*

স্পীড স্কিল স্ট্যামিনা কুইকমাইণ্ড সবই ছিল জয়ন্তর। অভিযান ক্লাবে ভাল খেলত। সেক্রেটারী কোচকে বলে—যদি যত্ন নেন এই ছেলেটা আমাদের ক্লাবের নাম রাখবে। হি ইজ আ গিফ্‌ট ফ্রম হেভেন। কোচ যত্ন নিয়েছিল, জয়ন্ত জান লড়িয়ে দিয়েছিল। অভিযান এক ডিভিশন ওপরে ওঠে। নামে অ্যামেচার হলেও কলকাতা ফুটবলের কাঠামো প্রায় প্রফেশন্যাল। অভিযান ক্লাব দক্ষিণা দিত বছরে দু হাজার টাকা। একদিন অভিযান বনাম ইষ্টার্ণ রেল ম্যাচ খেলে ফিরছে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় ঝকঝকে ফিয়েট। ওনার ড্রাইভার স্মিত হাসে।

—উঠে আসুন।

—আমি?

—হ্যাঁ আপনি। জয়ন্ত রায়। বিদ্যাসাগরের ছাত্র, খিদিরপুরের বাসিন্দা, অভিযানের খেলোয়াড়। পিনাকী সেন হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলে নিতান্ত অনিচ্ছায় জয়ন্ত উঠেছিল। সদ্য সেলুন থেকে ফেরা পিনাকীর গালে নীলচে আভা গায়ে লাইমজুসের গন্ধ। স্টার্ট দেয়।

—আমার একটা প্রস্তাব আছে, জয়ন্তবাবু।

—কী রকম প্রস্তাব?

—আপনি ইস্টার্ণ রেলে চলে আস্থন।

—চাকরী?

—হাঁ। পাশ করার পর চাকরী তো করতেই হয়। চাকরীও করবেন ফুটবলও খেলবেন। ঠিক আছে?

— না।

না বললেও জয়ন্ত চাকরী নিয়েছিল স্বাতীর মুখচেয়ে। আজ ঝগড়া হতে জয়ন্ত চেঁচিয়ে বলল—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। নিজের অবস্থান থেকে স্বাতী মৃদু অথচ কঠিন গলায় প্রশ্ন করল।

—কার জন্যে? আমার?

জয়ন্ত জবাব দেয়—হাঁ। তোমার জন্যে। তোমার জন্যে ফুটবলে পা দিয়েছিলাম। তোমার জন্যে রেলে ঢুকেছিলাম।

—ত্থাখো, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। সব কিছুর মূলে তোমার উচ্চাশা।

জয়ন্ত কেমন চুপসে যায়: মিছে নয়। উচ্চাশা ছিল। এখনও আছে। স্বাভাবিক সীমিত উচ্চাশা।

জয়ন্ত হাতের তালু দিয়ে তুচোখ ঢাকা দিল। উট পাখীর মত মুখ লুকোচ্ছে।

*

গা ধুয়ে স্বাতী চা বসাল। পরণে ছাপা শাড়ি, পাড় নেই শুধু ফুল পাতা। যেন ফুললি মালতী। সবুজ পাতার ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল। তু কাপ চা ও এক প্লেট নোনতা বিস্কুট টেবিলে রেখে চা বলতে জয়ন্ত স্থবোধ বালকের মত উঠে আসে। মুখোমুখি বসল ওরা।

দক্ষিণের খোলা জায়গা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সারা উপর আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। বাড়িগুলোর ছাতে ঝড়, তারে মেলে দেওয়া জামাকাপড় উড়ছে। বৃষ্টি নামল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বলল—ক মাস যা দুশ্চিন্তায় কাটছে।

—কেন?

—অফিসটিমে সিলেকটেড হব কিনা বুঝতে পারছি না।

—নাহলেই বা কী। অনেক তো খেলেছ। এবার জুনিয়ারদের চান্স দাও।

—এখনই! জয়ন্ত নির্লোম ভুরু কোঁচকায়—ববি চার্লটন পঞ্চাশ বছর বয়েসে বলেছিল, ফুটবল নিয়ে এমন মেতে আছি যে সরে যাবার কথা ভাবতেও পারি নে।

—কিন্তু তুমি যে আর খেলতে পারছ না।

—কে বলল? দীপংকর?

—না। কেউ বলে নি। বকুলবাগানের সঙ্গে খেলা আমি দেখেছি। তুমি একটা অনিবার্য গোল নষ্ট করেছ। সেকেণ্ড হাফের শুরুতে ব্যাক সীমানা থেকে বল ধরে সুন্দর উঠে এলে। সঙ্গে লিংকম্যান। বকুলবাগানের হাবিব কাছাকাছি হতে তুমি লিংকম্যানকে বল ঠেলে দিলে সে বল পেয়ে বাঁদিক থেকে নীচু করে শট্ করল। চলতি পা ছুঁইয়ে তুমি রাইট স্টপারকে ফাঁকি দিলে। লেফট স্টপার এগিয়ে এল। বল তখন ফাঁকায়। তুমি যদি আর একবার আলতো ছোঁয়ায় লেফট স্টপারকে পাশ কাটাতে পারতে তাহলে একটি অনবদ্য গোল। ঠিক না?

—ঠিক।

—কী হয়েছিল তোমার? হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেলে কেন?

—ভয় পেয়েছিলাম।

—ভয়? কিসের ভয়?

জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে দিল।

—পিনাকী সেনের। সায়েবের মুখটা যেন লেফট স্টপারে মুখে আঁটা। ভয়ে আমার পা ওঠে নি।

—পাগল !

—পাগল নয় স্বাতী। চাকরী কয়েক বছর করলে এমনি হয়। তুমি যদি কর তোমারও হবে।

স্বাতী বিশ্বাসও করল না অবিশ্বাসও করল না। সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে। মনে পড়ল বাবার লেখা : মাভৈঃ মন্ত্রের উদ্গাতা ব্রাহ্মণ নির্ভয় থাকার জন্যে দাসবৃত্তি গ্রহণ করেন না। পরেই মনে পড়ল দীপংকরের কথা : জমানা বদল গয়া। এখন আমরা অফিসারকে ভয় করি না। অফিসার আমাদের ভয় করে।

*

ছুটির দিন আলস্যের। স্বাতী রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গা এলিয়ে বসেছে। গোপালের মা নিপুণ হাতে রুটি বেলছে। প্রত্যিটি রুটি জ্যামিতিক গোল। হাতও চলছে মুখও চলছে।

—চাকরী কেমন লাগছে বৌদি ?

—ভালই।

—আমার একটা উপকার করতে হবে।

—কী ?

—দাদাবাবুকে বলে তো কিছু হল না।

স্বাতী বুঝতে পারল। বলে—আমিই কী গোপালের চাকরী করে দিতে পারব ?

—কেন পারবে নি ? চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারবে।

—ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব।

স্বাতী হাতের বইটায় মন দিল। কয়েক পাতা পড়ার পর ভাল লাগে না। প্যানপ্যানানি। উঠে গিয়ে এ টিন খোলে ও টিন খোলে। ডাল মসলা পাতি কী আনতে হবে দেখছে। গোপালের মা বলল—রেশম তুলেছি। চাল ভাল নয়।

—তুমি নেবে ?

গোপালের মা মাথা হেলিয়ে দিল। নেবে।

স্বাতী ফর্দ আর টাকা খাবার টেবিলের ওপর রেখে ফুলদানি চাপা দিল। বলে—কাল মসলাপাতি নিয়ে এস।

গোপালের মা একাধারে ঝি রাঁধুনী ও বাজার সরকার। জয়ন্ত ও স্বাতী চাকরী করেই খালাস। মানে, ঘরের কাজ বিশেষ কিছুই করতে হয় না। কখনও হয়ত জয়ন্ত মাংস কিনে আনল কখনও হয়ত স্বাতী চা জলখাবার করল।

রুটি তরকারী ঢেকে রেখে গোপালের মা চলে গেল। ফর্দ ও টাকা কাল নেবে।

দরজায় ছিটকিনি দিয়ে স্বাতী বসবার ঘরে ঢুকল। জয়ন্ত খবরের কাগজ থেকে মুখ তোলে।

—তুমি আজকাল টেণ্টে যাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছ।

—কখন যাব?

—কেন, ছুটির দিনে।

—আমার আর ভাল লাগে না।

স্বাতী আলস্যের হাই তুলল।

জয়ন্ত দুঃখ পায়। যদি ও নিজেকে ফুটবলের মাঠে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, অনেক অনেক টাকা, খবরের কাগজে ছবি, তাহলে আজও টেণ্টে যেতে ভাল লাগত স্বাতীর। মনে মনে বলে: তুমি আমাকে উচ্চাশাগ্রস্ত করে অবসন্ন করে পঙ্গু করে সরে দাঁড়াতে চাইছ। জয়ন্তর যা কিছু মনে মনে। খাঁটি পুরুষ মানুষের মত ও মনের আবেগ সহ্য করে। দুঃখ জানাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না। নিজের ক্ষমতা ও অক্ষমতা বুকের ভেতর পাশাপাশি রেখে দেয়।

*

খাওয়া দাওয়ার পর ছাতে খানিকটা পায়চারি করে জয়ন্ত ঘরে এল। স্বাতী বই পড়ছিল বিছানায় শুয়ে। উঠে বসবার ঘরে

গেল। জয়ন্ত বাতি নিভিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর মশারি তুলে ঢুকল। শুয়ে পড়ে।

বই শেষ করে স্বাতী ভাবতে বসল। কী ওর করা উচিত? কী করলে মোটামুটি সুখী হতে পারবে? যখন শুয়ে বসে সময় কাটত না তখন ভাবত চাকরী হলে সুখ শান্তি পেয়ে যাবে। কিছুই তো পেল না। নিজস্ব রোজগার এই মাত্র।

স্বাতী বিছানায় উঠে ভাল করে মশারি গুঁজল। তারপর টর্চ জ্বেলে ছাখে ভেতরে মশা আছে কিনা। যদি একটিও মশা থাকে আর তার অস্তিত্ব টের পায় তাহলে অস্থির হয়ে উঠবে। তখন এক বিনিদ্র প্রতীক্ষা মশার জন্যে।

শুয়ে পড়ে স্বাতী বুঝতে পারল জয়ন্ত জেগে আছে। এটা ও পারে। এক ধরনের ইনটুইশন। বলল—গরম পড়েছে।

জয়ন্ত একটা হাত স্বাতীর বাহুমূলে রাখল। কী ঠাণ্ডা! শরীর জুড়িয়ে যায়। সচেষ্ট হল। হাত যত্রতত্র বিচরণ করে। তলপেটের ঢালু মাঠে হাত চালিয়ে দিল। ক্লিপিয়ের জায়গাটায় হাত পড়তে বলে—মিলিয়ে আসছে দাগটা।

স্বাতী অস্বাভাবিক গলায় হেসে উঠল। জয়ন্ত বুঝতে পারে না কিছুই। এমন কি, হাসিটা সুখের না দুঃখের, তাও না।

*

মাঝরাতে স্বাতী এক স্বপ্ন দেখল।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। চারিদিক ঝাপসা। ঝড় উঠল সোঁ সোঁ শব্দে। গাছগাছালি বিপর্যস্ত। খড় কুটো কাগজছেঁড়া উড়ছে। ও দীপংকরের অপেক্ষায় চিরুণিপাতা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। গাছটাই আঁকড়ে ধরল

ঘুম ভেঙ্গে যায় স্বাতীর। গাছ নয় স্বামীকে আঁকড়ে ধরেছে।

জয়ন্ত বাহু বন্ধনে থেকেই বলল—খুব ভয় পেয়েছ।

—হাঁ। স্বপ্ন দেখছিলাম।

—কী দেখছিলে ?

—ঝড়।

—তাতে কী ?

—আমার ভয় করছিল বোধ হয় উড়িয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।

জয়ন্ত দুহাতে স্বাতীর শরীরটা চেপে ধরল। ঝড়ের বাপের সাধ্যি নেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। স্বাতী এলিয়ে পড়ে। জয়ন্ত উদ্যোগী হয়। সুরত সমাপি সুতল বরনাগর পাণি পয়োধর আপি।

৩

বিজনেস একজিকিউটিভ রাজেশ কাপুর যখন ঘুম থেকে উঠল তখন সাড়ে সাতটা। জানালায় এমন ভারী পর্দা যে ঘর অন্ধকার। বেড সুইচ টিপে দেখল বউকে। বুক ছেলেদের মতন, যৌবন সামগ্রী তেমন নেই। রাজেশ মনে মনে বলে : টুসি মাস্ট কনসিভ নাউ। এখন সাড়ে নটা। রাজেশ অফিস বেরোবে টুসি বলল—গাড়িটা আমার চাই।

—কখন ?

—দশটায় আমার মিটিং ?

—মিটিং ? কিসের মিটিং ?

—লিবের। সামনে নারীবর্ষ সম্মেলন। জানো না ? টুসি হাত বাড়াল—চাবিটা দাও।

রাজেশ চাবির রিংয়ে আঙুল ঢুকিয়ে ঘোরায়।

—উইমিনস লিবারেশন। যে দেশে পুরুষদেরই মুক্তি হল না, সে দেশে আবার নারী মুক্তি। ও সব লিব টিব ছাড়ো। ওতে কিছুই হবে না। আমেরিকার মেয়েরা তো কতকাল মুক্ত। তবু আন্দোলন কেন ?

টুসি এদিকে বেরোবে বলে রেডী। পরণে কাউ বয় সার্ট জীনের আঁটো সাঁটো প্যান্ট। মাথার আতেলা চুল আঁচড়ে কান ঢেকেছে। ঝটকা মেরে দাঁড়াল।

—তুমি বললেই ছাড়ব ? আমি কী তোমার বাঁদী ?

—বাঁদী না হোক বউ তো আমার।

—তাই বলে বাড়ি গাড়ির মত তোমার সম্পত্তি নই। টুসি সমতল বুক চিতোয়—উই বিলং টু নান বাট টু আওয়ার সেলভস্।

—সে তো বটেই। আমি আমার, তুমি তোমার। আমি আমার বাড়ি থেকে আমার গাড়ি চড়ে আমার অফিসে চললাম।

রাজেশ বাঁ চোখ কুঁচকে বেরিয়ে গেল।

টুসি ফুঁসতে থাকে। অফিসটা তোমার কিন্তু বাড়ি গাড়ি আমারও। আই উইল রিমেন হোয়ার আই অ্যাম অ্যাণ্ড মেক য়ুওর লাইফ হেল। আলমারি খুলে একগোছা বড় পাত্তি বের করে ব্যাগে ঢোকায়। তারপর বেরল।

রাস্তায় ছোটখাট ভিড়। মেয়েরাই বেশী। দর্শনীয় বস্তু সাদা অ্যামবুলান্স গাড়ি। দরজাটা হাট করে খোলা। স্ট্রেচারে একজন মহিলা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মড়ার মত নীরক্ত মুখ। চাদর ঢাকা পেটটা কেঁপে উঠল। বেঁচে আছে।

টুসি হতাশ চোখে তাকায়। নেচার ইজ মনষ্ট্রাসলি আনজাস্ট। বাচ্চা হওয়ার সব ঝামেলা মেয়েদের। পুরুষরা কেমন ঝাড়া হাত পা। এ চলতে পারে না বিজ্ঞানের যুগে। জেনেটিক কোড নিয়ে এত গবেষণা তবে কিসের জন্যে? ক্লাবে কথা বলতে হবে।

*

সাড়ে নটার সকালেও ক্লাব জনহীন নয়। সেক্রেটারী সোনিয়া ভার্গব চুল কাটিয়ে পার্লার থেকে বেরল। বেশ কিছুক্ষণ ধূমপান করেনি, বিচ্ছিরি লাগে। কাউন্টারে সিগারেট কিনে ধরায়। জল ফেলি জল তুলি হেঁটে প্যাসেজের মাঝামাঝি এসেছে হাত নাড়ল—হ্যালো টুসি!

টুসির মাথায় এখনও বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা ঘুরছে। মা হওয়া তো খারাপ নয়। ফেমুণ্ডিটি ইজ দা জিনিয়স অফ আ উয়োম্যান। তবে গর্ভ ধারণের বড় ঝামেলা।

টুসির কথা শুনে সোনিয়া বলল—এটা আজেণ্ডার একটা আইটেম। আলোচনা হবে এ নিয়ে। রিজোলিউশনও হতে পারে। মূল সমস্যাগুলোর কথা ভেবেছ?

টুসি মাথা হেলিয়ে দিল। ভেবেছে।

লাউঞ্জে দুচার জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। সকলেই পুরনো মেম্বার হলেও টুসির পরিচয় রীতার সঙ্গে বেশী। তাকে দেখতে পেল না। স্পোর্টস উয়োম্যান রীতা আসতে টুসি বলল—এত দেরী?

—দেরী! সুইমিংপুলে ছিলাম তো।

—আর কে ছিল?

—মুনমুন।

—ও ডিভোর্স পেয়েছে?

রীতা ঠোঁটের একটা ভঙ্গী করল। খবর রাখে না। বেয়ারা আসতে টুসি বীয়র আনতে হুকুম করল। তারপর বলে—মাঝে মাঝে এমন বোরিং লাগে আমার।

—স্বাভাবিক। তুমি একটা নিয়ে পড়ে আছ। তাই না?

—তাই।

—একটু এদিক ওদিক কর। ভাল লাগবে। স্টোলেন কিসেস আর সুইটার।

—ও আমার আসে না।

—জানি। কিন্তু করলে কী হবে। তোমার ভালবাসার বোধ সেকেলে। ওটা মিউসিয়মে রেখে দিও। রীতা হাসল। টুসিও। বীয়র এসে গেল। দুই মুক্ত রমণী সফেন জগে চুমুক দেয়। রীতা বলে—নাউ ইউ উইল ফীল স্টেডি।

টুসি ম্লান হাসল—সে আর কতক্ষণ।

তলানিটুকু শেষ করে রীতা বলল—উঠি।

কেন? এখনই উঠবে কেন?

রীতা রহস্যের হাসি হাসল—দেবর ঠাকুরের খবর নেব।

—দেবর?

—পতি দেবতাকে দাদা বলে, তাই। আসলে আমার বুল।

টুসি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। রীতা গাল টিপে বলল—আমার খাই খাইটা একটু বেশী। বাই।

রীতাকে আটকে রাখল টুসি, পালাতে দিল না। মিটিং রুমে টেনে নিয়ে গিয়ে সেক্রেটারীকে বলল—রীতা কিছু বক্তব্য রাখবে।

—ঠিক আছে। তোমার পরে।

—ওর একটু তাড়া আছে আজ।

—কিসের তাড়া?

সোনিয়া ভার্গব রাজী হল না। জবরদস্ত সেক্রেটারী। ইমানসিপেটেড উয়োম্যানদের কেমন করে সামলাতে হয় জানে। সুতরাং টুসি তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করল।

—লিব মুভমেণ্ট আমাদের গ্রামদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবার। আজকাল গ্রামের মেয়েরাও স্কুল কলেজে পড়ছে। তারা এখন আগের চেয়ে অনেক শক্ত। ছেলেদের চিনতে শিখছে। তাদের বলতে হবে; য়ু বিলং টু নান্ বাট য়ু'র সেলভস্। নিজেদের অধিকার বুঝে নাও। নিজেদের ভাললাগা না লাগা বজায় রাখ। পণ প্রথা, বধূ নির্যাতন এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।

সোনিয়া সন্তান ধারণের ব্যাপারটা মনে পড়িয়ে দিলে টুসি আরম্ভ করল।

—একথা সকলেই জানে সেই আদিমকাল থেকে আমরা এক মহান কর্তব্য করে চলেছি যার নাম সৃষ্টি রক্ষা। আমরাই সন্তান ধারণ করি, পুরুষরা নয়। এই কাজ বড়ই সময় সাপেক্ষ এবং অসুবিধার। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে তেমন কিছু করে নি। আমি অনুরোধ করি উপযুক্ত কথায় সন্তান ধারণ নিয়ে একটি প্রস্তাব লেখা হোক।

তখন নানা রকম কথা ওঠে। টেস্টটিউব বেবি বানিয়ে হল কী? ফারটিলাইজড্ ওভা তো সেই জরায়ু ঘরেই রাখা হচ্ছে। এতে

মেয়েদের কী লাভ? আর্টিফিসিয়াল ওভারির উদ্ভাবন চাই। আর কী? গর্ভকাল কমানো। তিন মাস করতে পারলে ভাল হয়, না হলে ছমাস। দশ মাস দশ দিন বড় দীর্ঘ সময়।

রীতা সেন উঠে দাঁড়াল।

—টুসি যা বলেছে তা ঠিক। লিব মুভমেণ্ট আমাদের গ্রাম দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবার। আজকাল গ্রামদেশেও প্রচুর লুপ আর পিল পাঠানো হচ্ছে। ফলে কমছে সন্তান ধারণ। এখন মেয়েদের বলতে হবে: য়ু আর ফ্রি। জীবনটা একটু ভোগ কর।

রীতা বসলে আবার আলোচনা হয়। প্রেম, বিবাহ, সহনশীলতা, বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে। প্রস্তাব লেখা শেষ হলে সোনিয়া বলল—রীতা টুসি এবার তোমরা যেতে পার।

*

পার্কস্ট্রীটে উঠে রীতা কবজির ঘড়ি দেখল। বারোটা। লাঞ্চ ইণ্টারভ্যালের আর এক ঘণ্টা বাকী। বলল—টুসি, তোমাকে কী বাড়ি পৌঁছে দেব?

—কেন? আমি থাকলে অসুবিধে হবে?

—তা নয়: রীতা একটু একটু স্টীয়ারিং ঘোরায়—তুমি রাজেশের সঙ্গেই তো লাঞ্চ করবে।

টুসি চুপ করে রইল। সেরকমই ব্যবস্থা। রাজেশ বাড়িতে খায়। এখন ওকে হয় অফিসে যেতে হবে না হলে বাসায়। বলল—আবার অদ্দূর যাবে। তার চাইতে মিশনরোডেই নামিয়ে দাও। ইচ্ছে করলে আসতেও পার।

—রাজেশের কাছে? না বাবা।

—কেন?

—টু বী ক্যাণ্ডিড, রাজেশকে আমার ভয় করে।

—ভয়?

—হাঁ। বিশুদ্ধ ভয়। কী কথা! পট পট করে বলল—বসাক

না হয়ে আমি হলে ঠিক তোমাকে কনট্রাসেপ্টিভ বলে অন্য কিছু খাওয়াতাম। তারপর দেখতাম তুমি কেমন ন্যাপকিন বদলাতে পার।

টুসি দুঃখের গলায় বলল—আমাকে আর এক মাস সময় দিয়েছে। তারপর কনস্ট্রাসেপটিভ চলবে না।

—হাউ শকিং!

—কী যে করি।

—ডোণ্ট বী নার্ভাস। ভাবো।

টুসি অনেক ভেবে বলল—তোমার হাবি বেশ। তোমাকে কিছু বলে না।

রীতা চাম্পিয়নের মত হাসে।

মিশন রোডে গাড়ি দাঁড়ালে টুসি হলুদ রংয়ের বাড়িটায় ঢুকল। ব্যাগে বড়পাত্তি গুলো গাদাগাদি পড়ে আছে। টুসি ভেবেছিল উড়িয়ে দেবে, পারে নি।

*

খাবার টেবিলে রাজেশ আর টুসি চুপচাপ খাচ্ছে। এক টুকরো পনীর মুখে দিয়ে রাজেশ বলে– কলকাতায় টিভি হয়েছে আর ক'বছর পরে টিউব রেলও হবে।

—তবে? টুসি মুখ তুলল—তুমি যে বল, দেশ এগোচ্ছে না।

—এগোচ্ছে আরও এগোবে। কথা তা নয়। সমাজ এগোচ্ছে না।

—সমাজও এগোচ্ছে। আজ সমাজ কত অ্যাকোমোডেটিভ। মেয়েদের কথাই বলি। তাদের আনইনহিবিটেড আচরণ সমাজ মেনে নিচ্ছে, অ্যাজ আ নাচারাল ওয়ে অভ লাইফ।

রাজেশ আস্তে আস্তে দুপাশে মাথা নাড়ল।

—তাই বলে কী মেয়েরা মুক্ত, স্বাধীন? আই মীন ম্যারেড

উইমিন। বোধ হয় তা নয়। তোমাকে আমি মিসেস স্বাতী রায়ের কথা বলেছিলাম। মনে আছে?

—হ্যাঁ। তোমার অফিসে চাকরী করে। আলাপ হয়েছে।

—আমার অফিসে নয়। নিউ ইণ্ডিয়া যতটা আমার ততটাই মিসেস রায়ের।

—তা কী হয়েছে ওর?

রাজেশের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়ায়।

—তুমি ওই যে আচরণ মেনে নেওয়ার কথা বলছিলে। মিস্টার রায় স্ত্রীর চাকরী করাটা পছন্দ করে না। হি ইজ মেকিং হার লাইফ হেল।

ট্রাসির চোখের মণি নড়ল। হিয়ার ইজ আ ভিক্টিম। স্বাতী যদি প্রটেক্শন চায় লিব ক্লাব দেবে প্রটেকশন। এখন মিসেস রায়ের অবস্থাটা দেখা দরকার।

৪

রান্নাঘরে উনুন ধরানো হয়েছে। চিমনী থাকলেও ঠিকমত ধোঁয়া নিকেশ হয় না। কিছু ধোঁয়া ডাইনিং স্পেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। স্বাতী রান্না ঘরের দিকে মুখ করে বলল—গোপালের মা, দরজা বন্ধ করে দাও।

ধোঁয়া কমলে স্বাতী পিটম্যানের বই নিয়ে বসল। ডিকসেনারীও নিয়েছে। শব্দের বানান মানে জানা দরকার আবার উচ্চারণও। নাহলে ইকড়িমিকড়ি কেটে বোকা বনতে হয়।

গোপালের মা ভাত বসিয়ে বলল—একটু নজর রেখো বৌদি। বাজার চললাম।

স্বাতী শুনল কিন্তু হুঁ হাঁ করল না। গোপালের মা রোজই বাজার যায়। ও রোজই নজর রাখে। রুটিন ব্যাপার। ও জল ঢেলে দেয় নাহলে নামিয়ে রাখে।

থলি হাতে গোপালের মা দরজা খুলেছে, জয়ন্ত হাত বাড়াল। আজ ও করবে বাজার।

*

খোলামেলা বাজার। বোশেখ মাসের চড়চড়ে রোদ অফিসের বাবুরা সইতে পারে না। আলু পটল খুঁজছে, ছায়াও। এত খোঁজাখুঁজি, বাবুরা হায়রাণ। জয়ন্তর পোড় খাওয়া শরীর, দিব্যি ঘুরছে ফিরছে বাজার করছে। ছায়া খোঁজাও নেই তাড়াহুড়োও নেই। মাছ তরকারী কেনার পর ব্লেডের জন্যে রাস্তার ওপাড়ে গেল।

'প্রয়োজনী'র স্টেশনারি কাউণ্টারের পাশেই নতুন আমদানি রেফ্রিজারেটার। জয়ন্ত অবাক চোখে তাকায়।

—কী ব্যাপার ?

—আইসক্রীম।

—বিক্রী হচ্ছে ?

—কোথায় আছেন জয়ন্তদা। আট আনার আইসক্রীম এক টাকায় বেচলেও পড়ে থাকে না। তাও অন্য কিছু কিনলে।

—আমাকে এক প্যাকেট ব্লেড দাও।

দোকানী ফ্রিজ খুলে আইসক্রীম বের করল।

—নিন। আপনি আমাদের পুরণো খদ্দের। আপনাকে আইসক্রীমের জন্যে ব্লেড কিনতে হবে না।

জয়ন্ত হা হা করে হাসল।

—আরে না। আমার ব্লেড ফুরিয়েছে। ব্লেডই দাও।

ব্লেড দিয়ে হরিপদ তেলানো গলায় বলল—জয়ন্তদা, মেয়েটার একটা চাকরী করে দিন না। ইতু বি, এ পাশ, টাইপিং জানে, দেখতে শুনতেও ভাল।

জয়ন্তর অস্বস্তি হয়। হরিপদ এমন কেন ? টাকা পয়সা আছে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে দিক। তা না, একটা চাকরী করে দিন।

হরিপদ করুণ চোখে তাকাল। বলে—বিয়ের চেষ্টা যে করি নি তা নয়। ছেলেরা চাকরী করা মেয়ে চায় আজকাল।

জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরল।

স্বাতীর চান হয়ে গিয়েছিল। খেয়ে উঠে জামা কাপড় পরবে, তা রান্নাই হল না। বিরক্তির মুখ করে বসে আছে। জয়ন্তকে দেখে ভুরু কোঁচকাল।

—এরপর কখন রান্না হবে কখন খাব কখন অফিস যাব ?

—অফিস যেতে হবে না।

—তার মানে ?

—আমার ইচ্ছে নয় তুমি চাকরী কর।

—তাই এত দেরী করে ফেরা। ঠিক আছে, আমি না খেয়েই অফিস যাব।

স্বাতী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। কাঁধে ব্যাগ ঝোলাতেই গোপালের মা স্বাতীকে হাত ধরে বসাল। ডাল ভাত আলু-ভাতে দিয়ে বলে—খাও, মাছ ভেজে দিচ্ছি।

জয়ন্তর যেমন স্বভাব, আপন মনে বিড়বিড় করে। মেজাজ! চাকরী করে দিনদিন মেজাজ চড়ছে। কাগজ খুলে খেলার পাতায় চোখ রাখল। দল-বদলের হীরোদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে—পলাশ ইস্ট বেঙ্গলেই ফিরে গেল…মনসুরের স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছাড়া ঠিক হয়নি। শেষে নিজের কথাই ভাবল। লীগের খেলায় এবছর মাঠে নামবে কিনা কে জানে। এই চিন্তা এমনই অস্থির করে যে সে কাগজ ফেলে উঠে পড়ল।

স্বাতী ওয়াশবেসিনে মুখ ধুতে ধুতে বলে—আমার চাকরী করায় তোমার আপত্তি কেন?

—চাকরী করে ঘর সংসার করা হয় না।

- খুব হয়। তুমি চাকরী করে খেলছ না?

—খেলছি কিন্তু ভাল খেলছি না। চাকরী করে খেলা হয় না।

—তাহলে খেলা ছেড়ে দিয়ে পাঁচ জনের মত চাকরী কর।

জয়ন্ত কোণঠাসা বেড়ালের মত তাকায়।

গোপালের মা ভয় পেল। স্বাতীকে বলে—বৌদি তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

*

সেকশনে ঢুকতে নিবারণ বলল—মিসেস রায়, আপনাকে সায়েব ডাকছেন। দেখা করে আসুন।

খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। রাজেশ কথনও ক্লার্ক বা

টাইপিস্টদের ডাকে না। যদি কিছু বলার থাকে জুনিয়ার অফিসারদের বলে। বড় জোর সুপারভাইসারদের।

স্বাতী কব্‌জির ঘড়ি দেখল। নটা চল্লিশ। খামোখা দেরী হল। কী দরকার ছিল বাজার করতে যাবার? অ্যাটেণ্ডান্স রেজিস্টার খুলতে চিত্তের প্রসন্নতা ফিরে আসে। যাক বাবা, লেট মার্ক পড়েনি।

সই করে স্বাতী জল খেল। দেরী হওয়ার ব্যাপার নয়। অন্য কিছু। কে জানে, হয়ত দীপংকর এসেছে। সেকশন থেকে বেরিয়ে শাড়িটা টেনেটুনে মুখটা মুছে নিজেকে গুছিয়ে নেয়।

রাজেশ এক পলক দেখল। নরম গলায় বলে—মিসেস রায়, আপনাকে একটা চান্স দিতে চাই। শর্টহ্যাণ্ড জানেন?

—সামান্য।

—পেন্সিল নোটবই নিয়ে আসুন। রাজেশ স্ক্রীনের দিকটা বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখায়।

উচ্চাশা স্বাতীর বুকটা দুলিয়ে দিল। চান্স আসছে।

সকাল বেলায় কাগজ হাতে নিয়ে স্বাতী দেখেছিল, আজকের দিনটা কেমন যাবে, চোখ আটকে যায়; মিথুনরাশি মহিলাদের চাকুরীতে উন্নতির সম্ভাবনা। ধীর স্থির ভাবে অগ্রসর হইতে পারিলে কৃতকার্য হওয়া সুনিশ্চিত।

ও ধীরস্থির হয়ে ডিকটেশন নিতে বসল। কান খাড়া। চোখের পলক পড়ে না। তার বাঁ হাত লাল লাইন টানা নোট বইয়ের ওপর, ডান হাতে পেন্সিল। আশুলিপিকা প্রস্তুত।

প্রথম কথাগুলো স্বাতী ঠিক বুঝতে পারল না। রাজেশের দিকে তাকাল বিষণ্ণ চোখে। বুঝেছি, বলে সে মুখ থেকে পাইপ সরাল। এবার স্বাতীর হাত দ্রুত পিটম্যানের ইকড়ি মিকড়ি কাটে। নোট নেওয়া হলে উঠল। স্ক্রীনের এ-পাড়ের ছিমছাম নিরিবিলিতে টাইপ

করে ফিরে এল। ভারী বুক ওঠানামা করে কিন্তু ক্লান্ত নয়। উচ্চাশা পুরুষের মত মেয়েদেরও অক্লান্ত করে তোলে।

কাজ দেখল রাজেশ। খুশী। গলার স্বরে ম্যানেজারের দূরত্ব রেখে বলল—ভাল। তারপর লাইটারটা টেপে। অমনি আগুনের শিখা লকলক করে। রাজেশ পাইপ ধরাল। নীল ধোঁয়ার বিসর্পিল রেখা ওপরে উঠতে উঠতে হারিয়ে যায়।

স্বাতী গন্ধটা পেল স্বাস নিতে। ভালই কিন্তু জোরে নিলে কটু লাগে। সুতরাং আস্তে আস্তেই স্বাস নেয়।

রাজেশ যেন অনুরোধ করছে, এমন গলায় বলল—বসুন।

স্বাতী বসল।

রাজেশ কয়েক পলক ভাবল। বলে—তিতি পট করে চাকরী ছেড়ে দিল। এমন হলে খুব অসুবিধে হয়। আপনি বছর পাঁচেকের বণ্ড সই করতে রাজী?

বণ্ডের নাম শুনে স্বাতী কেমন হয়ে গেল। পাঁচ বছর চাকরী করতেই হবে। চাকরী করা এবং চাকরীতে উন্নতি করা এসবই মন চায়। তবু ভয় পেল। বাঁধাবাঁধি সব সময়ই ভয়ের। বলল—ভেবে দেখি।

—দেখুন। কেরিয়ার করার কথা ভাল করে ভেবে দেখুন। রাজেশ কাজে মন দিল। স্বাতীও ওঠে। চলে আসছে, রাজেশ বলল—দীপংকর সান্যাল আপনার কে হয়? আত্মীয়?

—না। ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা। বন্ধু।

—তা বন্ধুর ভাল আপনি নিশ্চয়ই চান?

স্বাতী মাথা হেলিয়ে দিল। চায়।

রাজেশ চেতাবনী দেওয়ার গলায় বলে—টেল য়ুওর ফ্রেণ্ড টু ডিসাসোয়েট ফ্রম পারচেজ অফিসার বসাক।

স্বাতীর তখন ম্যানেজারকে ভয় কেটে যাচ্ছিল, বলে—আপনি বলুন না। আপনিও তো দীপংকরের বন্ধু।

—বন্ধু ? রাজেশ কাগজ-কাটা গলায় বলল—নট অ্যাট অল।

*

লাঞ্চ ইন্টারভ্যালে স্বাতী দীপংকরকে টেলিফোন করল।

—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—বেশ তো। আমাদের ক্যান্টিনে চলে এস। খাওয়াও হবে কথাও হবে। দীপংকর একটু থেমে বলল—ছাতা সঙ্গে নিও। রোদের খুব তেজ।

স্বাতী অফিস থেকে বেরল। স্মৃতিচারণে মন্থর।

আইবুড়ো বেলায় কেমন সাজতাম গুজতাম, আয়নায় মুখ দেখতাম। মশগুল ছিলাম নিজেকে নিয়ে। একদিন কী যে হল ভাল লাগে না। কেবলি মনে পড়ে কীর্তনিয়া মেসোমশাইয়ের পদ : পিরীতে বাঁধিব ঘর। তখন কতই বা আমার বয়েস। উনিশ কুড়ি। টাইপিং শেখা সুরু করেছি। দীপংকরের সঙ্গে ভাব হয়েছে। ওর গান শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। মন চনমন করে ওকে পাওয়ার জন্যে। অঙ্গনে আওব যব রসিয়া, পালটি চলব হম ঈষৎ হসিয়া। তার সুযোগও এসেছিল। দাদা চাকরী পেতে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে। খাওয়াদাওয়া আর তার সঙ্গে গান বাজনা। আমি দীপংকরকে ধরে নিয়ে এলাম। দাদার না হোক আমার বন্ধু। সে রাতে দীপংকর কীর্তন গায়। মিতুল ভীষণ ছেলেঘেঁষা। এমন করছিল দীপংকরকে নিয়ে যে, আমার সহ্য হয় নি। শুধু মিতুলকে দেখানোর জন্যে যে দীপংকর আমার বন্ধু—মিতুলের নয় সুরু—করেছিলাম বাড়াবাড়ি। ফলে জিনিসটা ঘটে যায়। তারপর সারারাত শরীরের গভীরে রক এন রোল বাজনা।

ছাতি মাথায় দীপংকরের অফিস যেতে স্বাতী সহসা সেই বাজনা শুনতে পায়। আর শ্রীমতীর রোদ্দুর লাগেনা। ভানুর কিরণ শীতল ভেল।

স্বাতী যেন ভেসে চলেছে। চোখে সুখস্বপ্নের ঘোর। অটো-

মোবিলের আনাগোনা টের পায় না। রীতা গাড়ি দাঁড় করালে টসি বলে—ডাকছি শুনতে পাচ্ছেন না ?

—না তো। স্বাতী ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল।

—শুনুন। বিকেলে আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি।

রীতা গাড়ি স্টার্ট দিল। ট্রাফিক পুলিশ তাড়া দিচ্ছে। এটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে গল্প করার জায়গা নয়। স্বাতী ভেবে পায় না ম্যানেজারের স্ত্রী ওদের বাড়ি কেন আসবে।

*

ক্যান্টিনে ছোট একটা টেবিল ঘিরে বসেছে দীপংকর আর স্বাতী। দীপংকর কেমন যেন অন্যমনস্ক। স্বাতী একটা টোস্ট তুলে নিয়ে প্লেটটা ঠেলে দিল।

—খাও।

—আমার তো রয়েছে।

—রয়েছে তো কী হয়েছে ? আমারটা থেকেও খাও। স্বাতী রাজেশের চেতাবনী শোনায়।

দীপংকর একটু ভাবল। ভেবে বলল—বসাকদা বাড়াবাড়ি করছেন ঠিকই। নাম্বার ওয়ান ঘুষখোর।

—তাহলে ? তুমি ওর সংস্রব ত্যাগ কর।

—সে কী আর সম্ভব। বসাকদা ডিপার্টমেণ্টাল অফিসার।

—তাতে কী হয়েছে ?

—চীফ যদি আমাকে বসাক-দার কাছে পাঠান তাহলে যেতেই হবে।

স্বাতী চায়ের কাপ তুলেছিল, নামিয়ে রাখল।

—তখন থেকে কী বসাকদা বসাকদা করছ। তিনি অফিসার, আর তুমি ?

—আমি ? আমি দীপংকর সান্যাল। চীফের সহায়।

—কিছু একটা হলে মরবে।

—না।

বলে দীপংকর তাকায়। স্বাতীর মুখ দেখে কেমন হয়ে গেল। তিল এক লাগি উপজল নেহ। বলে—ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি বসাকদার পাশ কাটাব। তুমি মন খারাপ কোরো না।

স্বাতী খুশী হয়ে হাসল। হাসলে এখনও নিটোল গালে টোল পড়ে।

দেড়টা বাজে। দীপংকর উঠল। চিন্তিত। ও যে বলল বসাকদাকে পাশ কাটাবে, সেটা মনের কথা নয়। মনের ইচ্ছা বসাককে পথে বসাবে। শুধু স্বাতীকে খুশী করতে বলা।

এককালে দীপংকর স্বাতীর হাসিমুখ বুক পকেটে বয়ে বেড়াত। পার্কের পুবকোণে বকুলগাছ, তার তলায়, সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে চুমু খেত স্বাতীর পটলিখা। তখন হৃদয় জুড়ে হাসি-মুখীকে খুশী করার ইচ্ছা।

সে ইচ্ছা আজ দীপংকরের।

*

অফিস ছুটি হতে স্বাতীর খেয়াল হয়, মিসেস কাপুর বাসায় পদধূলি দেবেন। ও সম্ভাব্য কারণটা বের করতে সচেষ্ট হল। বড়-লোকের নিছক কৌতূহল হতে পারে আবার কোন মতলবও থাকতে পারে। হয়ত কাপুর স্টেনোর কাজটা আর কোন মেয়েকে দিতে চায়, মত বদলেছে।

স্বাতীর রাগ হয় কিন্তু রাগে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখে। এটা খুব বড় পরিবর্তন। আগে হলে মাথা গরম করত। এর অবিশ্যি অন্য কারণও আছে। অফিস আর ঘর এক নয়। ঘরের লোক হাজার হোক আপন, তার বেলা মাথা গরম করা চলে।

স্বাতী নিউ মার্কেট থেকে কাজু বিস্কুট আর ভাল চা কিনল। কিছু ফুল কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু নেবার অসুবিধের কথা ভেবে

সোজা চলে যায় বাস স্টপ। ঘেমে গিয়েছিল, কোমরে আটকানো রুমাল বের করে মুখ মোছে।

রুটের বাস আসতে স্বাতী কোনরকমে উঠল। দোরগোড়ার যাচ্ছেতাই ভিড় ঠেলতে বেচারী রগড়ে যায়। কষ্ট হলেও গা করে না।

*

আকাশে এখনও আলো রয়েছে, বাইরে তাকালে মনে হয় না ছ'টা বাজল।

স্বাতী গা ধুয়ে আয়নার সামনে বসেছে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মুখ। চুল খুলে দিল। চিরুনি দিয়েছে, কড়ানাড়ার শব্দ উঠল। ডাইনিং স্পেসে এসে দাঁড়ায়। গোপালের মা দরজা খুলে দিচ্ছে। তাই সে আর এগোল না।

ঘরে ঢুকল টুসি, গোপালের মাকে পাশ কাটিয়ে। পরনে আশমানী রংয়ের শাড়ী ব্লাউজ, হাতে একরাশ ফুল। চেয়ারে বসে অবাক চোখে তাকাল।

—বেশ চুল আপনার। কী তেল মাখেন?

—নারকেল। স্বাতী কোম্পানীর নামটা বলল।

—তেল কোম্পানীকে জানান আপনার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবে।

—বিজ্ঞাপন? বিজ্ঞাপনে ছবি আমি দেব কেন?

টুসির চোখের মণি নড়ল। এ কোন্ টাইপের মহিলা? অফিসে চাকরী করে, একটা লাভারও আছে অথচ বিজ্ঞাপনে ছবি দিতে আপত্তি। আপত্তিটা কিসের? পিউরিট্যালিসস্? আন্‌সেন্স অফ ডিগনিটি?

গোপালের মা ট্রে নামালে স্বাতী টুসির মুখোমুখি বসল। বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে তাকায় যা ওর স্নানোত্তর সজীবতার সঙ্গে বেমানান।

—মিসেস কাপুর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—স্বচ্ছন্দে।

—নিউ ইণ্ডিয়ায় চাকরী করা আর কোন মেয়ের বাড়ি আপনি গিয়েছেন ?

—না।

—আমিই একমাত্র মেয়ে। স্বাতী শুধরে নিল—একমাত্র না হলেও প্রথম। কী সৌভাগ্য আমার।

টুসি উসখুস করে। কী ভাবে সুরু করবে বুঝতে পারে না। আচমকা বলল—মিসেস রায়, আপনি দীপংকর সান্যালকে ছেড়ে দিন।

স্বাতী পট থেকে লিকার ঢালছিল, হাতটা কাঁপতে লিকার চলকে পড়ে। এই মাত্র। দুধ চিনি ঠিকঠাক মেশাল। তারপর মুখ নামিয়ে হাসে।

—কেন ?

—আমার এক বন্ধু রীতার অনেকদিনের বন্ধু দীপংকর।

—যতদিনেরই হোক, আমার থেকে বেশী দিনের নয়। সে যাক, ছেড়ে দেওয়ার কথা উঠছে কেন ?

—সে রীতা জানে।

—আপনি কিছুই জানেন না ?

স্বাতী ঘাড় সোজা করে টুসির চোখে চোখ রাখল।

টুসি অকপট রীতা ও তার বন্ধুর কথা বলে। মন দিয়ে স্বাতী শুনল। একটিও কথা বলল না। ভাবনায় পড়েছে দীপংকরকে নিয়ে। রাজেশ যার সঙ্গে মেলামেশা করতে মানা করেছে সেই অতীন বসাকের স্ত্রী রীতা। তায় আবার দীপংকরের বন্ধু।

৫

হিপক্রিসি করতে করতে মানুষ বুঝি এমনি হয়ে যায়। যা নয় তা বলা যে অন্যায়, মনেও হয় না। তা নাহলে দীপংকর কেন স্বাতীকে বলবে, চীফ ওকে পারচেজিং অফিসারের সঙ্গে লেনদেন করতে বাধ্য করে। যা কিছু ঘুষের কারবার দীপংকর সান্যাল আর অতীন বসাকের মধ্যে। দীপংকর যে পড়েছি মোগলের হাতে ভাব দেখায়, তা সত্যি নয়।

বসাকের কিউবিকলে দীপংকর মুখ ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা। উঠি উঠি করছে কিন্তু উঠতে পারছে না! ও যেন রসের গামলায় পড়া মাছি। এ খেয়াল নেই, এরপর চেষ্টা করলেও উঠতে পারবে না, তা ও যতই চতুর হোক।

সুইং ডোর ঠেলে বসাক ঘরে ঢুকল।

—কী ভাবছ ?

—ভাবনার শেষ আছে নাকি ? কিছু ছাড়ুন। বড় টানাটানি যাচ্ছে।

—উইডোয়ারের আবার টানাটানি।

—আপন গড বলছি বসাকদা। পাওনাদারদের কিছু দিতেই হয়।

—আই সী।

অতীন র‍্যাক থেকে একটা ফাইল টানল।

—আলফা বীটা কোম্পানী। বিলটা একটু এদিক ওদিক করিয়ে আনো। এক পার্সেন্ট পাবে।

দীপংকর বিলটার ওপর চোখ বোলাল। অতীন একটি চিরকুট এগিয়ে দিলে সেটিও পড়ল। তারপর চোখ কপালে তোলে।

—অ্যাকশল স্যাস্ট কনেকটিং রড অ্যালুমিনিয়ম পেইণ্ট করে দেবে ?

—হুঁ। পালিশ না নিলে রং চড়ানো ছাড়া আর উপায় কী !

—আপনি একটি জিনিয়াস, বসাকদা।

—তুমিও। কী করে যে মানুষ ভেজাও কে জানে।

দীপংকর সাপের হাসি হাসল।

*

লাঞ্চ ইণ্টারভ্যালে স্বাতী এল দীপংকরের অফিসে। ক্যান্টিনে চা টোস্ট নিয়ে দুজনে যথারীতি বসল। স্বাতীর মুখ ভার। সেদিন টুসি যা বলেছিল তা শুনে অভিমান হয়েছে দীপংকরের ওপর। সোহি বিমুখ আজে। বিমুখ হওয়াটা দীপংকরের একান্ত অনুগত বলে।

স্বাতী যেমন সোজাসুজি বসাকের সংস্রব ত্যাগ করতে বলেছিল তেমনি রীতার সংস্রব ত্যাগ করতে বলতে পারছে না। ভয় হয়, বললে দীপংকর চটে যেতে পারে। তখন ?

স্বাতীর বিষণ্নতা লক্ষ্য করেছে দীপংকর। কারণটা অবিশ্যি বোঝে নি। নরম গলায় বলে—মন খারাপ কেন সই ?

কারণটা বলতে না পারায় স্বাতীর চোখ ছলছল করে।

দীপংকর একপলক ভাবল। যেমন পুরুষ মানুষ ভাবে তেমনি। তারপর বলে—সই ! তোমার নিজস্ব রোজগার হয়েছে। ইচ্ছে মত চলতে পার। তুমি মুক্ত তুমি স্বাধীন।

—না। স্বাতী কেঁদে ফেলল—আমি স্বাধীন নই।

দীপংকর নির্বাক।

চোখ মুছে স্বাতী মুখটা করুণ করল—দীপ, তুমি ভাল হও, অনেস্ট হও। আমি তোমার ওপর নির্ভর করতে চাই।

—বেশ তো। দীপংকর আশ্বাস দেওয়ার গলায় বলে—চাকরী চাইলে, করে দিলাম। আর কী করতে হবে, বলো।

স্বাতী ভাবে। দীপংকর ওর চাকরী করে দিয়েছে শুধু নয়। পড়ার নোট যোগাড় করে দিয়েছে। টাইপিং শিখতে সাহায্য করছে। কি কহব রে কানুক গুণ। রুদ্ধগলায় বলল—তুমি মিস্টার বসাকের বাড়ি যাও কেন?

দীপংকর চেষ্টা করেও সত্যিকথা বলতে পারল না। জিভটা যেন খাপে মোড়া। সেই যা নয় তাই বলতে উৎসাহিত হয়।

—আর বল কেন? বসাকদা এক কাজ ধরিয়ে দিয়েছেন। ওঁর মা চোখে ভাল দেখতে পান না। বৃদ্ধাকে আমি খবরের কাগজ পত্র-পত্রিকা পড়ে শোনাই। বিনিময়ে মাসিক দুশো টাকা পাই।

স্বাতী সম্মোহিতের মত শুনে যায়। সুন্দর মুখ সুন্দর চাউনি সুন্দর কথা বলার ভঙ্গী দীপংকরের। হেরইতে প্রাণ হরি লই। কোন যুবতী সম্মোহিত না হয়ে পারে?

কাহিনী আরও মোহন করার জন্যে দীপংকর বলল—বুড়ী কলেজের লেকচারার ছিল। দারুণ রাশভারি। বেচাল একদম সহ্য করতে পারে না।

সত্যিকথা না হলেও এর যে সবই মিথ্যে তা নয়। অতীনের মা যথার্থই বৃদ্ধা এবং এক সময় অধ্যাপিকা ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই পত্র-পত্রিকা পড়েন। দীপংকর কিছুদিন পড়ে শুনিয়েছিল এই মাত্র। আসল ব্যাপার রীতা। তার জন্যেই সপ্তাহে দুদিন অতীনের ফ্ল্যাটে যাওয়া।

দীপংকর চা শেষ করল। এবার বিষণ্ণ স্বাতীকে হাসাবার প্রয়াস পায়।

—সই।

—বলো।

—আমার চীফের ডিকটেশন দেওয়াটি বেশ।

—বেশ মানে?

স্বাতীর চোখে শোনার-আগ্রহ রয়েছে। দীপংকর নিপুণ অভিনেতার মত চিঠি ধরার ভঙ্গীতে হাতের একটা মুদ্রা করল।

—টেক ডাউন ··ইয়াস টেক ডাউন ··উইথ রেফারেন্স টু য়ুওর ফলনা ফলনা লেটার, ডেটেড ফলনা···উই য়ুড লাইক টু ইনফরম য়ু ছাট অন ফলনা ফলনা ডেট আওযার পারচেজ অফিসার কলড. অ্যাট্ য়ুওর শোরুম অ্যাণ্ড ইন্সপেকটেড্ য়ুওর ফলনা।

স্বাতী হেসে ফেলল। তখন দীপংকর একটা খবর দেয়। ওদের অফিসে স্টেনোর পোস্ট বদল হচ্ছে। স্টার্টিং পে তিনশো।

*

ছুটির পর দীপংকর করিডরে দাঁড়িয়ে। লং শটে দৃষ্টি ছড়াল। প্রথমে চিনতে পারল না। কাছাকাছি হতে বুঝতে পারল বসাকদা। একটু অবাক হল। মানুষটা দিন দিন ছোট হচ্ছে নাকি ?

অতীন কুণ্ঠার সঙ্গে বলল— কতক্ষণ ?

—এতক্ষণ। দীপংকর আঙুল দিয়ে দেখাল পায়ের কাছটা।

নিঃশেষিত সিগারেটের টুকরগুলোর ওপর নজর রেখে অতীন হাসল।

—পুরো এক প্যাকেট ?

—দাম দেবেন।

—হুঁ। এক্সপেণ্ডিচার রাইজেস টু মীট দা ইনকাম।

—বসাকদা ?

—কী ?

—আজ আমি আপনার সঙ্গে যাব না।

—রীতাকে বলেছ ?

দীপংকর মাথা নাড়ল। বলেনি।

শনিবার রীতা-ডে। কিন্তু আর রীতাকে ভাল লাগে না। এটা কম বলা হল। রীতাকে রীতিমত ভয় করে দীপংকর। বকুনির ভয়। ওদের রতি অভিসার পদার রতি সুখসারে গতম্ অভিসারে এমন

নয়। যদিও নায়িকার পীন পযোধর এবং নায়কের মর্দন চঞ্চল করযুগশালী তবু। এ এক বিপরীত রতি অভিসার। রবারফোম শয্যায় চুম্বন আশ্লেষ সবই আছে ভালবাসা নেই।

দীপংকরের সুখের ভাঙচুর দেখে মায়া হল অতীনের। বলল—ঠিক আছে, বাড়ি যাও। আই উইল গিভ হার আ স্টোরি।

—স্টোরিতে যেন আবার স্বাতীকে ঢোকাবেন না।

—আরে না। অতীন সস্নেহে দীপংকরের পিঠ চাপড়ে দিল—। তুমি কী মনে কর, আমি আমার স্ত্রীকে চিনি না? আই নো দ লিব-উয়োম্যান ভেরী ওয়েল।

*

দীপংকর লালদীঘির পাড়ে অলস পায়ে ঘুরল ফিরল ঝালমুড়ি কিনে কিছু খেল কিছু ছড়াল আবার চিরুন্নিপাতা গাছতলায় দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে গেল। স্বাতী ওর ওপর নির্ভর করতে চায়। তার মানে, জয়ন্তর ওপর নির্ভরতা কমছে। চিন্তায় চিন্তায় দীপংকরের কপালে ভাঁজ দেখা দিল। জয়ন্তর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া এখনও হয় নি। ঠিক করেছিল ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে পেটাবে, সেটা কার্যকরী হয় নি। বিলি ছেলেটা বেপাড়ায় কাজ করতে রাজী হয় নি। পিনাকী সেনের কান ভারী করার চেষ্টা চলছে। দেখা যাক কী হয়। আর কোন্ উপায় আছে? আচ্ছা, স্বাতীকে দিয়ে কিছু করা যায় না?

প্রতিশোধ চিন্তায় কাতর দীপংকর যাদবপুরের বাস ধরল।

বাসের একবারে শেষের লম্বা সীটে পাঁচজন ভদ্রলোক বসেছে। একজন মোটা, তাহলেও চেপে বসলে আর একজনের জায়গা হয়, কিন্তু চেপে বসবে না। দীপংকর সামনে দাঁড়াতে মোটা রুক্ষ চোখে তাকাল।

বাস চলেছে। ভবানীপুর আসতে মোটা এমন করে যেন পরের স্টপেই নামবে। দীপংকর পোজিশন নিল। অধীর প্রতীক্ষা চলতে

থাকে। বাস যখন রাসবিহারী মোড়ের কাছাকাছি, দীপংকর আর পারল না। বলে—দাদা কী নামবেন? মোটা ঘাড় কাত করল। নামবে। দীপংকর আর কোনদিকে তাকাল না। তাকালে হয়ত বসবার জায়গা পেত। বাস গড়িয়া এল, মোটা নামে না। দীপংকর আবার জিজ্ঞেস করতে মোটা ভালুকের মত মুখ করল।

—কেন?

—নামব নামব করছিলেন কিনা তাই।

—নামব কিন্তু এখানে নয়। টার্মিনাসে। আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই ভোগা দিয়ে শোধ নিলাম।

দীপংকর একটুও চটল না। মুখে ভক্তির আঠা। বলল—গুরু, পায়ের ধুলো দিন।

পারলে গড় হয়ে প্রণামই করত। সঙ্কল্প পাঠের মত উচ্চারণ করে: আমি ভোগা দিয়ে শোধ নেব।

৬

রোববারের সকাল। যারা সপ্তাহের ছ'দিন জীবিকা নিয়ে ছিল, আজ তারা ঘুম থেকে উঠে জীবন নিয়ে পড়েছে। ভালই করেছে। জীবের জীবন সার। মীনক পানি। জীবক জীবন।

দীপংকর তার সখের ফুলবাগানে পায়চারি করছিল, মুখ তুলে তাকায়। চিলেকোঠার ছাতে টিভি এরিয়ালের মত টং। চোখে পড়তে ও জোরে জোরে হাততালি দেয়। এমনি এক ঝাঁক পায়রা ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ল। পায়রাগুলো একই জায়গায় ঘোরে, মাঝে মাঝে ডিগবাজি খায়। দীপংকর দেখে আর হাসে।

এই এক সখ। হাতীবাগান থেকে মুখী, লক্কা, লোটন, গেরোবাজ কিনে আনে পোষে। গোলাপায়রাও আনে সেগুলো কাটে আর খায়।

গেরো বাজগুলো ক্লান্ত হয়ে টং-এ বসলে দীপংকর তার বাগানে পায়চারি করে। কী ছিলাম আমি ?

*

বছর দশেক আগে কী ছিল এই দীপংকর। বাবা খুন হলে একটা লোক পাশে দাঁড়ায় নি। মা ও ছেলে সহায়সম্বলহীন। সেই অসময়ে জয়ন্ত একটি পাঞ্চে ওর নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল। দারুণ ত্রাসে দীপংকরের মন কুঁকড়ে যায়।

যতীন কলোনীতে এসে দীপংকর পাড়ার এক মাস্তানকে ধরে। বিলি, তোকে একটা কাজ করতে হবে। বিলি বেপাড়ায় কাজ করতে রাজী হয় না। তখন ঈশ্বরকে ধরে। মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। মাধব মিনতি রক্ষা করেন না। জয়ন্ত বহাল তবিয়তে ফুটবল খেলে। স্বাতীর সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল। খবর পেয়ে কীর্ত-নিয়া-পুত্র কেঁদে ফেলেছিল। বঁধুয়া আন বাড়ি যায়। তারপর চোখের জল শুকোলে দীপংকর নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। পাঁচ

জন চালাক চতুরের দেখাদেখি টিউশনি আর রিফুইজি সার্টিফিকেট জোগাড় করে ফেলে। তারপর কলোনীতে তিনকাঠা জায়গা জবর-দখল করে ছ্যাঁচাবেড়ার দেয়াল আর টালির চাল দিয়ে বাড়ি বানায়। স্যাঁতসেতে মেঝেয় মাদুর কাঁথা ভিজে যেত। তেল ফুরিয়ে লণ্ঠন নিভে ঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কে যেন গভীর গলায় দীপংকরকে বলত: যেমন করে টিউশনি, সার্টিফিকেট, তিন কাঠা জায়গা পেয়েছিস তেমনি করেই চাকরী পাবি। কোথাও না কোথাও একটা ফাঁক হবেই। দেখতে পেলে ঢুকে পড়বি। ন্যায় অন্যায় ভাববি না। সাফল্যের এটাই পথ। দীপংকর শুনতে শুনতে আরও চালাক চতুর আরও ফাঁক-সন্ধানী হয়ে যায়।

ফাঁক একটা হয়েছিল।

মেশিনারী কর্পোরেশনে নেওয়া হচ্ছিল স্টেনো। পরীক্ষা দিয়ে দীপংকর দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। ফাঁক একটা তো মানুষ সতেবোটা। মুখ ঝুলিয়ে চলে আসছে, সেই অন্ধকারের গভীর স্বর শুনতে পেল। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ায়। না, ভাল মানুষের মত বাড়ি গেলে হবে না। দীপংকর রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেছিল। বেরিয়ে পড়ে ফাঁকে ঢুকবার গোপন গলি।

তিনমাস বিনা বেতনে মেয়েকে পড়াতে অফিসার বলে—রমা খুব একটা সুন্দরী নয় কিন্তু বড় ভাল। তোমার পছন্দ হয়েছে?

—হয়েছে।

—তাহলে তো তোমাদের ভাবসাব ধরে নিতে পারি।

—হাঁ।

—খুব ভাল। অফিসার মেয়ের দিকে তাকায়—রমা, তুমি ভেতরে যাও। আমি দীপংকরের সঙ্গে দু-একটা কাজের কথা বলি।

রমা ভেতরে গেল। অফিসার মুখ খোলে—দীপংকর, চাকরী তোমার হবে। প্রথমে অবিশ্যি আমার অফিসে নয়। সেটা

খারাপ দেখাবে। কিছুদিন একটা রং কোম্পানীতে কর, রিটায়ার করার মুখে টেনে নেব। ঠিক আছে?

দীপংকর মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল।

চাকরী ও বিয়ের পর অফিসার জ্ঞানীর গলায় বলে—বউ সুন্দর হল না বলে দুঃখ হতে পারে। তবে যদি মনে রাখো রমার জন্যেই চাকরী, তাহলে দুঃখ হবে না।

*

চৈত্রমাস। ভোরবেলা ঘর থেকে বাগান ভাল। গা জুড়ানো বাতাস এখানে। দীপংকর বাগানে বেতের চেয়ার পেতে বসল। রমার জন্যেই চাকরী। তা ও ভোলে নি। ইতি উতি তাকায়। বাগানে গাছপালা সে-ই লাগিয়েছিল। গেটে মালতী, গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথের দুধারে মল্লিকা। সত্যিই বড় ভাল মেয়ে। তবে কেন ও রমাকে ভালবাসতে পারে নি?

মলয় পবন বহে। বাতাসে বাসি ফুলের গন্ধ। বিগত রাতে অজস্র মল্লিকা ফুটেছিল তারি সুবাস, বড় ক্ষীণ, যেন গন্ধের ছায়া। সেই ছায়াপথে বিগত দিনের রমা ভেসে এল আজ দীপংকরের মনে। সে যে রমণী পরম গুণমণি।

দীপংকর আয়েস করে বসতে পারে না। চেয়ার ঠেলে উঠল। অশান্ত পায়ে পায়চারি করে। কী করতে পারতাম আমি?

*

মেশিনারী কর্পোরেশনে দিব্যি স্টেনোর চাকরী করছিল দীপংকর। তিনকাঠা জায়গায় একতলা বাড়ি বানিয়েছিল। আর কালো মেয়ে রমার বুক উজাড় করা ভালবাসা পেয়ে আবার পদাবলী কীর্তন ধরেছিল। শোনো রাই রজকিনী রামী, শীতল জানিয়া ও দুটি চরণ শরণ লইনু আমি।

কিন্তু রমার সঙ্গে দীপংকরের প্রেম স্থায়ী হয় নি।

মেশিনারী কর্পোরেশনে পারচেজিং অফিসার হয়ে আসে অতীন

বসাক। বন্ধু সুতরাং চেনা লোক। মাঝে মাঝে যেত বসাকের বাড়িতে। প্রথম যৌবনের দুর্দিনে বসাক অবিশ্যি ছিল জয়ন্তর দিকে।

বসাকের ফ্ল্যাটে যাওয়া আসা করতে করতে দীপংকরের বাড়ির টান ইলাস্টিক সুতোর মত ঢিলে হয়ে যায়। বেশ লাগে অতীনের বউ রীতাকে। বামা অধিক চঙ্গিম ভেল। কত নে যতনে কত অদ্ভুত, বিহিবিহি তোহে দেল।

রীতার উষ্ণ সান্নিধ্য দীপংকরের ভালবাসার ধারণাটা বদলে দেয়। ওর মনে গজায় নতুন চিন্তা। যে মেয়ে টানে না তার সঙ্গে ভালবাসা অসম্ভব। এতদিন রমার সঙ্গে যা হয়েছে তা শুধুই কর্তব্যপালন।

শনিবার রীতা-ডে। নিম্নমধ্যবিত্ত দীপংকরের কাছে গ্রীষ্মে সুখ-শীতলা শীতে সুখোষ্ণ পাঁচতারা কক্ষ ও বর্নাঢ্য পানভোজন নিরতিশয় তৃপ্তিকর। আর রূপবতী রীতা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। চাঁদবদনী ধনী বচন কহসি হসি। অমিয় বরিখে জনি শরদ পুর্ণশশী।

দীপংকরের স্ত্রীর প্রতি অবহেলা ধীরে ধীরে নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে চলে যায়। ও রমাকে সহ্য করতে পারত না। পঁচিশ বছরের যৌবন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কেস কেরোসিন।

*

সাতটা বাজে। বাড়ির ভেতর সাড়া শব্দ হচ্ছে গেরস্থালি কাজের।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে দীপংকর বাগান ছেড়ে ঘরে ঢুকল। রমার স্মৃতিই বিচলিত করে। সেটা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই যেন জোরে ডাকল —মা।

—কী। চিন্ময়ী রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলেন।

দীপংকর চাতালে উঠে বলল—চা দাও।

চিন্ময়ী ছেলের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বললেন—বাজার যাবি তো?

—নাঃ। ময়না যাক।

—কেন? চিন্ময়ী চোখের কোণে তাকালেন—রোববারে বাজার তো তুই করিস। চা খেয়ে ঘুরে আয়।

—শরীরটা কেমন করছে।

—তাহলে আমি যাব।

চিন্ময়ীর বয়স হয়েছে কিন্তু শরীরে এখনও মজবুত আছেন। দাঁত পড়েনি, গাল ভাঙেনি। শুধু মাথার চুল কাশ ফুল।

দীপংকর বিরক্তির গলায় বলে—তোমাকে আর যেতে হবে না। আমিই যাব জলখাবার খেয়ে।

চিন্ময়ী রান্নাঘরে ঢুকলেন আবার।

আধঘণ্টার মধ্যে জলখাবার তৈরী। ময়না প্লেটে করে লুচি বেগুনভাজা ডিমের ওমলেট দিলে দীপংকর খেতে বসল। ময়না কাছেই ঠমক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুব ছমছমে শরীর। চিন্ময়ী রান্নাঘর থেকে দেখলেন। দেখে ডাকলেন—এদিকে আয়।

চা দিয়ে চিন্ময়ী বললেন—কাল রোদে ঘোরাঘুরি হয়েছিল খুব।

—কেন? দীপংকর মুখ তুলল।

—মিতুলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিলাম।

—কী হয়েছে মিতুলের?

—প্রোটিনের অভাবে যা হয়। ভেতরটা খালি। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

—তা মিতুল অমন কেন? টেলিফোন অফিসে চাকরী করে। রোজগারের টাকায় ভালমন্দ খেলেই পারে।

—ভালমন্দ আর খেতে হয় না। টেলিফোন অপারেটারের কতই বা মাইনে। ওই টাকায় বাসাভাড়া, ট্রামভাড়া, জামাকাপড়, ঝিয়ের মাইনে, কিছু বাড়িতেও পাঠায়।

দীপংকর শোনে আর আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। চিন্ময়ী চেয়ার টেনে পাশে বসে বললেন—মিতুল বড় ভাল মেয়ে রে। দীপংকর উসখুস করে। মাকে ও চেনে ভালই। এইবার মিতুলের ঘটকালি করবে। বাকী চাটুকু না খেয়েই উঠল।

বারান্দার পশ্চিম দিকে সিঁড়ি। সেদিকে এগোয়।

দীপংকরের শোবার ঘর দোতলায়। এটা নতুন সংযোজন। অনেক টাকার ব্যাপার। মোজেককরা মেঝে, ডিসটেমপারকরা দেওয়াল, জানালায় সুদৃশ্য গ্রিল।

দীপংকর ইজিচেয়ার টেনে বসল। আস্তে আস্তে সিগারেট টানে আর ভাবে। এ রকম যে হবে রীতাকে নিয়ে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। এত খাই খাই ওর! কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। কেবলই আমার অক্ষমতার অভিযোগ। আর ওর কাছে যাচ্ছি নে।

*

দীপংকর থলি হাতে বেরোলে চিন্ময়ী তাঁর ঘরে ঢুকলেন। রান্নাঘরের পাশেই তক্তপোষের ওপর গোটানো বিছানায় ঠেস দিয়ে পা ছড়ালেন। হাতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কিন্তু পড়ছেন না। চোখ বুজে রয়েছেন। গতকাল মিতুলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়ে রোদে ঘোরাঘুরি হওয়ার কারণ হাসপাতাল কর্মচারীদের উদাসীনতা। কেউ তাঁর মুখের দিকে তাকায় নি। সকলেই ব্যস্ত। তাই এ বিল্ডিং ও বিল্ডিং করতে হয়েছিল।

চিন্ময়ী শুয়ে শুয়ে মানুষের পরিবর্তনের কথা ভাবছেন। মানুষ দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে! নিজেরটি ছাড়া কিছু বোঝে না।

দীপংকর বাজার করে ফিরল।

—ময়না, ইলিশ এনেছি। ভাল করে রাঁধ।

—কী রাঁধব?

—ভাপা মাছের ঝাল। পারবি তো?

—পারব। বলে ময়না মাছ বাছতে বসল।

চিন্ময়ী বেরিয়ে এসে দেখলেন আলু পটল গড়াচ্ছে। উচ্ছে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করতে দীপংকর বলল—উচ্ছে ওঠে নি। চিন্ময়ী প্রত্যয় পেলেন না। সবই বুঝলেন। নিজের যা ভাল লাগে তাই এনেছে।

দীপংকর বাথরুমে ঢুকল। সাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। অবিরল জল গড়িয়ে যায় তবু শরীর স্নিগ্ধ হয় না। শরীরের ভেতরে যে মন সেখানে জ্বালা। কী যেন করার কথা প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কিন্তু করা হয়ে উঠছে না।

দীপংকরের এক নম্বর প্রতিপক্ষ জয়ন্ত রায়। তার সর্বনাশ করার জন্যে কত যে চিন্তা।

মাথার চুল আঁচড়াবার সময় আয়নায় মুখ দেখল দীপংকর। জুলপির ওপর কয়েকটা পাকা চুল। সন্না দিয়ে চারটে চুল তুলে ফেলল।

বাতাসে ভাপা ইলিশের সুঘ্রাণ। শরীর ও মন চনমন করে দীপংকরের। নাগর ভাবটা জেগে ওঠে।

*

বিকেলে কালবোশেখীর ঝড় উঠল। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ভেজা কাক বাড়ির কার্নিশে ডানা ঝাড়ছে। পায়রাগুলো খোপের ভেতর। টং একদম খালি।

দীপংকর সাজগোজ করে নেমে এল। ধুতি পাঞ্জাবি পরলে ফুলবাবু। রোগাভাবটা তেমন চোখে পড়ে না। ডান হাতে গোমেদ ও নীলার আংটি।

চিন্ময়ী বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়েছিলেন। দীপংকর পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল—মিতুলকে দেখে আসি। এমনিই বলল। যেতেও বা না যেতেও পারে। রুগ্না মিতুলকে মনে নেয় নি। মনে নিয়েছে স্বাতীকে।

দীপংকর মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনল এক প্যাকেট। দাম

দিয়ে মনিব্যাগের হাঁ করা মুখে দেখে নিল রেস্ত ঠিক আছে। বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে খানিকটা এগিয়েছে, থমকে দাঁড়াল।

রাস্তার ধারে ভবেশবাবুর বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। ছাত নেই, জানালা দরজা নেই। দেয়ালগুলো বড় নিঃস্ব দেখায়। এই দৃশ্য দীপংকর যতই দেখে ততই বিচলিত হয়। কে জানে হয়ত একদিন ওর বাড়িও বিক্রী হয়ে যাবে। নতুন মালিক ভেঙেচুরে করবে এই অবস্থা। বুকে ধোঁয়া আটকে বিষম খায়। কোথাও কিছু নেই, মানুষটা ছটফট করে। ভাঙাবাড়ি কাকতাড়ুয়ার মত ভয় পাইয়ে দিল। হাতের নীলা কপালে ঠেকায়, তবু ভয় যায় না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রুমাল বের করে ঘাম মুছল। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে।

*

হাসপাতালে মিতুল ভালই আছে। এখন আর মাথা ঘোরে না তবে দুর্বলতা রয়েছে। সারাদিন শুয়েই ছিল, বিকেল হতে উঠে বসেছে।

মিতুল দেখতে সুন্দরী নয়, গায়ের রঙ কালো, মুখ চোখ সাধারণ, শরীর তেমন প্রলুব্ধ করে না। কেমন যেন উদাসিনী। কিন্তু মিতুলের মুখের দিকে তাকালে ভাল লাগে। চোখের দৃষ্টি খুব করুণ, ঠোঁটের হাসি বড় মায়াবী। মিতুলের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বললে শান্তি পাওয়া যায়। প্রতিবাদ করে না, খোঁচা দেয় না।

কমলা ও মুসাম্বির ঠোঙা নামিয়ে পায়ের দিকে দীপংকর বসল। এমন একটা মেয়ে, তবু ভাল লাগে না। মনে মনে বলে, বড্ডে সাদামাটা, না এলেই হত। মুখে কিন্তু অন্য রকম। আশ্চর্য নরম গলায় বলল—মিতুল, খবর পেয়েই ছুটে এলাম।

—দেখুন তো কী রকম জ্বালাচ্ছি আপনাদের। মিতুল চোখে জল এনে ফেলল।

দীপংকর পরিস্থিতির খাতিরে বলে—জ্বালাবে কেন? এতো আমার কর্তব্য।

মিতুল লজ্জা পায় কিন্তু কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করে না।

প্রথম যৌবনে একজন শিক্ষিত বেকার ছেলের সঙ্গে ভাবভালবাসা হয়েছিল মিতুলের। বিয়ের পিঁড়িতে বসা শুধু বাকী। ছেলেটা চাকরী পেলেই সেটা হয়। পেল কিন্তু মিতুলকে বিয়ে করল না। মানুষ চিনতে না পারার লজ্জায় মিতুল আত্মহত্যা করেছিল কিন্তু মরে নি। দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল। বেঁচে উঠে মিতুল যোগিনী।

দীপংকর উঠে দাঁড়ায়।

—আসি।

—আসুন। মাসীমাকে বলবেন, দু-একদিনের মধ্যেই আমি ফিরব।

—তারপর ছুটি নাও।

—নেব। এক সপ্তাহ।

—আরও বেশি নাও। নিয়ে বাড়ি ঘুরে এস। একা একা থাকবে কী করে?

মিতুল চুপ করে রইল। ইচ্ছে হয় বলে, আপনারা তো রয়েছেন, কিন্তু বলে না। ইচ্ছেটার টুঁটি টিপে ধরে। আর একবার ভালবাসবার মত মনের জোর নেই।

*

দীপংকর ট্রিংকায় দু পেগ হুইস্কি আর কিছু মিউজিক নিয়ে সন্ধ্যেটা কাটাল। সুখী সুখী ভাবটা আসে আর চলে যায়। কারণ স্বাতীর আসার কথা কিন্তু আসে নি।

বেয়ারা গেলাস খালি দেখে দাঁড়াল। দীপংকর মাথা নাড়ে। আর লাগবে না। বেয়ারা বিল এনে দিল।

ময়দানের দিকে বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। একলা থাকলে যা মাঝে মাঝে হয়। দীপংকর ভয় পেল। ভাঙা বাড়িটার

নিঃস্ব দেয়ালগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। বুকের ভেতর ইনভেস্টিগেশন অফিসার সওয়াল করল: টেল মী দা সোর্স অফ ওয়ান এণ্ড হাফ লাখ অফ রুপিজ। কোথায় পেলেন বাড়ি করার টাকা? বিরক্ত হয় স্বাতীর ওপর। ও এলে সন্ধ্যেটা মাটি হত না।

বাড়ি ফিরে দীপংকর বসবার ঘরে গুম মেরে বসে রইল। বারান্দায় চিন্ময়ী পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসেছেন। দু-চারটে কথা কানে আসে।

অভ্রকুমার বলল—এক ভদ্রলোক রোজ আমাদের পাড়া থেকে মাটি নিয়ে যাচ্ছে মাসীমা।

—কোন্ মাটি?

—রাস্তার। সি. এম. ডি. এর খোঁড়ামাটি।

—নিলে তো ভালই। বর্ষায় কাদা হবে না।

—না মাসীমা। অভ্রকুমার মুখ গোঁজ করল—পাড়ার মাটি বেপাড়ায় নেওয়া চলবে না।

চিন্ময়ী হাসলেন—যাক, একটা ব্যাপারে অন্ততঃ তুই নিজের অধিকার বুঝে নিতে শিখেছিস।

দীপংকর উঠে এসে মিতুলের সংবাদ দিল। চিন্ময়ী শুনলেন। তাঁর মনে মিতুলকে বউ করার ক্ষীণ আশা উঁকি দেয়। মিতুল রমার মতই রূপে ধনী নয় কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। বললেন—পারিস তো নিয়ে আসিস সঙ্গে করে।

দীপংকর শুনতে পেল কি পেল না। মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। স্বাতী যেমন ওর ওপর নির্ভর করতে চায় ও-ও তেমনি স্বাতীর ওপর।

৭

কখন যে কী হয় তার ঠিক নেই। জয়ন্তর সামান্য একটা কথায় স্বাতীর মন হাহা করে। বাইরে যাওয়া হয় না।

বেরোবে বলে সাজগোজ করেছিল। ডাইনিং স্পেশে দাঁড়িয়ে শাড়ীর ভাঁজটাঁজগুলো ঠিক করছে, জয়ন্ত দুম করে বলল—আমার আর ভাল লাগছে না।

এই কথার প্রত্যেকটি শব্দ স্বাতীর মনে প্রতিধ্বনিত হয়। আমার—আর—ভাল—লাগছে—না। ও নিজের কথাই ভাবে আর মন হাহাকার করে। এর নাম দাম্পত্য জীবন? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আমারও আর ভাল লাগছে না।

জয়ন্তর খারাপ মনটা খিঁচড়ে গেল। কেউ কারও নয়। কোথায় স্বামীর কথা ভাববে তা না নিজের উপাখ্যান। নির্লোম ভুরু কোঁচকায়।

—তোমার আবার কী হল?

—সে কথা তোমাকে বলে লাভ নেই।

—কেন?

—তুমি তোমার খেলা নিয়ে আছ। আমার কথা ভাব?

জয়ন্তর মন আরও খিঁচড়ে গেল। ও ভাবেনা তো কে ভাবে? দীপংকর? মেরুদণ্ডহীন লোকটা? যার আত্মসম্মান বোধ নেই। বলে—তুমি কী মনে কর, দীপংকর তোমার কথা ভেবে চাকরী করে দিয়েছে?

—নয় তো কী?

—অত ভাল মানুষ দীপংকর সান্যাল নয়। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। কী ওর মতলব?

স্বাতী নিরুত্তর। ও দীপংকরকে বুঝতে পারে না। বউ মারা যাওয়ার পর এতগুলো বছর কেটে গেল তবু আইবুড়ো ভাঁড় কেন? মিতুলের অসুখ করলে হাসপাতাল ছোটাছুটি করে কিন্তু ওই পর্যন্ত। ঘরে তুলছে না। কেন? রীতাকে ভালবাসে আবার ঘেন্নাও করে। এ কেমন ভালবাসা? স্বাতী এবার নিজের কথাই ভাবে। চাকরী করে দিয়েছে শুধু নয়, ওর সুখস্বাচ্ছন্দের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা দীপংকর যেমন ভাবে তেমন আর কেউ নয়। তবু কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব। কেন?

জয়ন্ত আবার হেঁকোড় দিল।

—দীপংকরের মতলব কী?

—জানি না।

—মিথ্যা কথা।

স্বাতীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। কানের লতি, নাকের ডগা লাল। রগের শিরা দপ দপ করে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

—আমি মিথ্যে কথা বলতে শিখি নি।

—শিখছ। দীপংকরের কাছে।

—কে বলেছে?

জয়ন্ত চুপ করে থাকে। গভীর রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না কিন্তু দীপংকরের মুখটা মনে পড়তে শিরায় শিরায় আগুন ছোটে। যে নিষ্ঠুরতা একদিন ঋতুকে হায়রাণ করেছিল সেই নিষ্ঠুরতা কালকেউটের ফণা তুলে ছোবল মারল।

—আমি সব জানি। লাঞ্চ ইন্টারভ্যালে ক্যান্টিনের শীতল পরিবেশে দীপংকর তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে শেখায় আর তুমি অতি আগ্রহে শেখ। তুমি দেরী করে ফিরলে আমি কিছুই বলি নে, তবু তুমি মিথ্যে কৈফিয়ৎ দাও। দিয়ে সুখ পাও। এ স্বভাব তোমার ছিল না।

স্বাতীর চোখ জ্বালা করে। নিজের অজান্তে কখন যে হিপক্রিসি

মনে ঠাঁই নিয়েছে বুঝতে পারে নি। পাগলিনীপ্রায় জামা কাপড় খুলে ফেলল।

*

বাতি নিভিয়ে দিলেও শোবার ঘর গাঢ় অন্ধকার হয় না। রাস্তার আলোর ছটা খোলা জানালা দিয়ে আসে। বিছানায় জয়ন্তর অবয়ব দেখা যায়।

স্বাতী জয়ন্তর কথাগুলো মনের ভেতর নাড়াচাড়া করে। দেরী করে ফিরলে আমি কিছুই বলিনে। কেন বলে না? জিজ্ঞেস করলেই পারে। তাহলে সত্যি মিথ্যে কিছুই বলতে হয় না। দীপংকরের সঙ্গে যে ভালবাসা তা জানাতে পারে।

ঘুম পেয়েছে, শব্দ না করে স্বাতী হাই তুলল। তারপর মুখে ক্রীম ঘষে মশারির ভেতর ঢোকে। মাথার ওপর পাখা তবু হাওয়া লাগছে না। নাইলনের মশারিও হাওয়া আটকায়। স্বাতী উসখুস করে। জয়ন্ত পাশ ফিরল।

—স্বাতী।

—উঁ।

—অনেকগুলো শক্ত শক্ত কথা বললাম। জয়ন্ত সস্নেহে স্বাতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—দুঃখ পেয়েছ?

স্বাতী মাথাটা জয়ন্তর চওড়া বুকে রাখল। দুজনকে জড়িয়ে থাকে প্রসন্ন নীরবতা। কিছুক্ষণ পর স্বাতী বলে—তুমি বড় নিষ্ঠুর।

—হ্যাঁ। কড়া কড়া কথা বলি।

—তা নয়।

—তবে?

—তোমার বড় অবহেলা।

জয়ন্ত দুই সবল হাতে স্বাতীকে পিষ্ট করে। শরীরের যা পাওনা তা শরীর ঠিক পায়। ঝামেলা মন নিয়ে। দুটো শরীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর যথাপূর্বম্। মনের ব্যাকুলতা ফিরে আসে।

স্বাতী অনেক চেষ্টা করেও দীপংকরকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। চিন্তায়ে বিকল হৃদয় নহি থিরে।

*

সাত সকালেই চড়চড়ে রোদ। জয়ন্ত বিছানা থেকে উঠেছে কিন্তু স্বাতী ওঠেনি। ওর আজ খুব আলসেমি। জয়ন্ত কিটব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্বাতীকে বলল—শুনছি রিজার্ভ লিস্টে নাম। এক্সট্রা।

—তার মানে, জার্সি গায়ে দিয়ে সাইড লাইনে বসে থাকবে?

—পিনাকী সাহেবের ইচ্ছা হলে তাই। যদি কোন রেগুলার না আসে নামব।

জয়ন্ত পা টেনে টেনে শোবার ঘর থেকে বেরোয়—হাঁটুতে ব্যথা, পা মুড়তে পারে না। এই পা নিয়ে ও কয়েকটা মুভ রপ্ত করবে।

স্বাতী বিছানা থেকেই পা টানা দেখল। বলে আজ নাই বা গেলে।

—তা হয় না স্বাতী। মাঠে আমাকে যেতেই হবে।

—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে?

—আমার ঈশ্বর।

—ঈশ্বর নয় উচ্চাশা।

—ঠিক বলেছ। জয়ন্ত হাসতে হাসতে নেমে গেল।

*

গোপালের মা ব্যস্ত হাতে উনুন ধরায়। বাজে গুল, কয়লা গুঁড়ির চেয়ে মাটি বেশি, ধরতে চায় না। পাখা করে করে হায়রাণ। গ্যাস জ্বেলে স্বাতীকে চা করে দিল।

স্বাতী ইকড়ি মিকড়ি প্র্যাকটিস করছে। সর্ট হ্যাণ্ড আর ইংরেজী জ্ঞান জল-মাছের সম্বন্ধ। ডিকশনারী টানতে জগদীশচন্দ্র বোসের স্টেনোকে মনে পড়ল। তিনি নাকি ডিকশনারী মুখস্থ করতেন। মেলা ডিকশনারী ছিল তাঁর। একই শব্দের কোন অভিধান কী অর্থ লিখেছে, না দেখে বলতে পারতেন। ফাউলার সায়েবের ডিকশনারী

বেরোলে তিনি বের করেছিলেন গোটা কয়েক ভুল। লণ্ডনে চিঠি লিখলে ফাউলার সায়েব দ্বিতীয় সংস্করণে ভুল সংশোধন করে-ছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁকে।

এ সব স্বাতীর দীপংকরের মুখে শোনা। ক্যান্টিনে অথবা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে শুনেছিল। ভোলে নি।

কিছুক্ষণ পিটম্যান নাড়াচাড়া করতে স্বাতীর মনে দীপংকর উঁকি মারে। তুমি যেমন আমার ওপর নির্ভর কর আমিও তেমনি তোমার ওপর করি। যা বলব করবে তো?

*

মাঠে ফুটবল পেটাপেটি করতে জয়ন্ত হাঁটুতে হাত রেখে বসে পড়ল। অসহ্য ব্যথা। ভাস্কর মুখ লুকিয়ে হাসছে। বেতো ঘোড়া। জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে পা ফেলে।

টেন্ট থেকে কিটব্যাগটা তুলে নিয়ে চৌকিদারকে ট্যাক্সি ডাকতে বলল। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল চেয়ার টেনে বসে। অমন একটা শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষকে বড় অসহায় দেখায়। চোট খাওয়া মানুষটার চোখের সামনে বিগত দিনের এক ছবি ভাসছে।

ভাস্কর, সুব্রত, মনোজিৎ এরা ঘিরে ধরেছে ওকে। সুব্রত মোজা বুট পরিয়ে দিতে পায়ের ধুলো নেয়। ভাস্কর হাতে তুলে দিল কোকাকোলা। কোচ পিঠ চাপড়ে বললেন—রেলের সুনাম তোমার হাতে। সুব্রত বলে, হাতে নয় পায়ে। সবাই আওয়াজ দিল, জয়ন্ত যুগ যুগ জীয়ো।

জয়ন্তর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। কয়েকটা বছর মাত্র। জয়ন্ত রায় মরে গেল। নিজেকে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। ট্যাক্সি আসতে উঠল। বলে—ধর্মতলা। ডাক্তার বীতশোক ব্যানার্জি।

একটা গলির ভেতর ঢুকল ট্যাক্সি। দুপাশে পুরনো বাড়ি। বাগানঘেরা দোতলা বাড়িটার সামনে জয়ন্ত নামল। ট্যাক্সি ব্যাক করে। খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে এগোতে পারে না।

বীতশোকের অযত্নের বাগানে এক সিংহ ভূলুণ্ঠিত। এই সিংহের দিকে তাকাতে জয়ন্তর কষ্ট হয়। একদা যা বাড়ির মর্যাদা ছিল তা আজ গৌরবহীন। ছাগলছানা তার ওপর লাফিয়ে চলে। ভাল করে নজর করতে জয়ন্ত অবাক। পশুরাজের সারা মুখে পরিব্যাপ্ত আশ্চর্য প্রস্তরীয় উদাসীনতা। শিল্পী যেন জানত এমনটা একদিন হবে। জানত এই জগতে কিছুই থাকে না।

ভূলুণ্ঠিত সিংহ জয়ন্তকে দুঃখ ভুলিয়ে দিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। চেম্বারে ঢুকলে বীতশোক বলল—কত বুড়ো হয়ে গেছিস।

জয়ন্ত বন্ধুর হৃষ্টপুষ্ট শরীর এবং টানটান মুখের চামড়া দেখল। খোদার খাসি। মনের সুখে আছে, হ্যাপা বলতে নেই। ওর মত বউ-চাকরী-খেলা সামাল দিতে হলে আর কাঁচা কার্তিকটি থাকতে হত না। সোফায় বসে বলল—ফুটবলারের যৌবন আসে আগে, যায়ও আগে।

বীতশোক কয়েকবার ওক দেবার মত মুখ খোলাবন্ধ করল। এই এক মুদ্রাদোষ ওর। জয়ন্ত হাঁটু দেখিয়ে বলে—বড় ব্যথা।

—ফুটবলারের হাঁটু। মালাইচাকি নড়ে গেছে। ব্যথা তো হবেই।

—নড়াচড়া নয়। পরীক্ষা করে ছাখ।

—এক্সরে করিয়েছিস?

—হাঁ। জয়ন্ত কিটব্যাগ থেকে প্লেট বের করল—এই যে।

আলো ফেলে বীতশোক প্লেট খুঁটিয়ে দেখল। মুখ গম্ভীর করে।

—কেস সীরিয়স।

—কী হয়েছে?

—সে কনফার্ম হলে বলব। এখন যা বলি শোন। প্লাস্টার করে দিচ্ছে। বেশী নড়াচড়া করবি না।

—চাকরী?

—ছুটি নে।

—খেলা?

—বন্ধ।

জয়ন্ত মুখটা করুণ করলে বীতশোক বলল—ঘাবড়াচ্ছিস কেন? মাসখানেকের তো ব্যাপার। এক কোর্স ইনজেকসন নিবি। ব্যস।

—তারপর?

—তারপর প্লাস্টার কাটা হবে। এক্সরে হবে। চিকিৎসা হবে। সে পরের কথা পরে। ফরগেট ইট। বীতশোক ভিজিটার্স স্লিপের ওপর চোখ রাখল—ওপরে চলে যা। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্লাস্টার করে দেবে। আমি কজন পেসেণ্ট দেখে আসছি।

*

বীতশোক বড়লোকের ছেলে। এই বাড়িটা পৈত্রিক কিন্তু এর মধ্যে একটু মিথ্যে আছে। বাড়ির মালিক ওর ঠিক পিতা নয়। দেশভাগের সময় মা এই বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর ভদ্রলোককে বাবা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন। সত্যিকারের বাবা যে কে বীতশোক জানে না। শুধু জানে, সে একজন রেপিস্ট। সে যাক। ভদ্রলোক একজন রেপিস্টের ছেলের সব ভার নিয়েছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন খরচ করে। মৃত্যুর আগে দিয়ে গেছেন বাড়ি। নীচ-তলায় চেম্বার ওপর তলায় অ্যাপার্টমেণ্ট। রোগী দেখা শেষ হলে বীতশোক উঠে এল। রবার সোল জুতো, একটুও শব্দ হয় না।

জয়ন্ত প্লাস্টারকরা পা মেলে বসেছিল। এখন আর ব্যথা নেই। বেশ হাসিখুশী। বলল—আমার সঙ্গে প্রথম দেখা মনে আছে?

—কেন থাককে না? তখন হায়ার সেকেণ্ডারী পড়ি। ভবানীপুরের একটা ক্লাবে খেলি। সেদিন আমাদের একজন প্লেয়ার কম ছিল। নক্ষত্র কত সাধাসাধি করল তবু বলে পা দিলি না। যেই ওর সুন্দর বোনটা বলল—প্লীজ, অমনি খেল সুরু করলি।

—হাঁ। স্বাতীই আমাকে খেলা ধরায়।

—এবার বোঝ ঠেলা। যা ভাবছি তা যদি হয় পা-খানি কেটে বাদ দেব ।

—হয়েছে। সে সাধে আর কাজ নেই। জয়ন্ত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, পারে না। বলল—এবার আমাকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

—বাড়ি গিয়ে কী করবি? বউ তো অফিস গেছে। এ বেলা এখানেই থেকে যা। বিকেলে স্বাতীর হাতে তুলে দিয়ে আসব। বউয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকবি।

—খুব যে বউ বউ করছিস। বিয়ে টিয়ে হচ্ছে না কি?

—বিয়ে! আমার বাবাই বিয়ে করল না, আমি তো ছেলে-মানুষ। বীতশোক চোখের কোণে হাসল--অতীনের, তোর বউ দেখেই আমার সুখ।

—কাকে দেখে বেশী?

—ভাবনায় ফেললি। বীতশোক একটু ভেবে বলে--দিন কয়েক আগে রীতা এসেছিল। কী মেয়েরে বাবা। তিন জগ বীয়র গিলে একটুও টলল না।

—এসেছিল কেন?

—পিলের সাইড এফেক্ট। বীতশোক শব্দ করে হাসল—অতীনের বুকটা একবার পরীক্ষা করতে হবে।

—কেন? কী প্রয়োজনে?

—কতদিন অতীন ওর বউয়ের ভালবাসা সহ্য করতে পারবে সেটা ওর জানা দরকার। বেচারা বড় দুর্বল। রেজিসট্যান্স পাওয়ার কম।

বেয়ারা বীয়রের বোতল জগ যত্ন করে সাজিয়ে দিল। প্লেটে সসেজ ও পটাটো চিপস্। জয়ন্ত একটা সসেজ মুখে দিল। এরপর কণ্ঠনালী দিয়ে যতই পানীয় নেমে যায় ততই সুখীভাব মাথায় উঠতে

থাকে। মনে বিশ্বাস এসে যায় যে, হাঁটু ঠিক হয়ে যাবে আর জয়ন্ত রায়ের নামে মাঠ কাঁপবে আবার।

*

বিকেলবেলা বীতশোকের কাঁধে ভর দিয়ে জয়ন্ত দাঁড়াল। বন্ধু বলে—পারবি না। স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছি।

—স্ট্রেচার লাগবে না। শক্ত করে ধরিস, তাহলেই হবে।

—না। সিঁড়ি দিয়ে নামা রিস্কি। ও চলবে না। বস। বীতশোক অনিচ্ছুক বন্ধুকে জোর করে বসিয়ে দেয়—গোঁয়ার্তুমি করবি না জোতদারের ব্যাটা। তা হলে মরবি।

স্ট্রেচার ও স্ট্রেচার বেয়ারারা এল। জয়ন্ত মড়ার মত শুয়ে থাকে। ভাল লাগে না। সজ্ঞানে কেউ মানুষের কাঁধে চাপে?

গাড়িতে উঠে বলল—বীত, আমি বড় গোঁয়ার তাই না?

—গাঁইয়ারা গোঁয়ার হয়। তা তুই তো অনেকদিন কর্পোরেশনের জল খেলি। এবার একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চল।

জয়ন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল—এ কথা বলছিস কেন?

—তোর গোঁয়ার্তুমির জন্যই স্বাতী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

—না।

—হাঁ। সেইজন্যে চাকরী, দীপংকরের কাছে যাওয়া। বী অন য়ুওর গার্ড। ম্যান বিহাইণ্ড য়ু।

· তোর কি মনে হয় স্বাতী এখনও দীপংকরকে ভালবাসে?

—আ য়ুওম্যান ইজ নেভার টু ওল্ড টু বী টাচড্ বাই দা ফেথফুলনেস অফ অ্যান ওল্ড লাভার।

নাগাল—৫

৮

বাঁহাতের ভাঁজে বাসি করা জামাকাপড় নিয়ে স্বাতী বাথরুমে ঢুকল। স্নান করে গা মুছছে অমনি কলিংবেলের ট্যা ট্যা। করছে তো করছেই। ও চট করে সোজা হতে পারে না। উচ কুচ মানয় ভার। কোনরকমে শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল। পিঠের ওপর এক ঢাল খোলা চুল। চিকুর গলয় জলধারা।

খাটিয়ায় সটান লম্বা জয়ন্ত এবং খাটিয়ায় কাঁধ দেওয়া নীচের ভদ্রলোকদের দেখে স্বাতী ঘাবড়ে যায়। বীতশোক আরও ঘাবড়ে দিল। বলে—কোথায় নামাবে?

স্বাতী কয়েক পলক স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত চোখ বন্ধ করে নিঃসাড়ে পড়েথাকলেও বুকেরখাঁচাটা একটু একটু ওঠানামা করছে। তাই দেখে বুঝল যা ভেবেছিল তা নয়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। না এতবড় সর্বনাশ ও সইতে পারবে না। উথাল পাতাল এগিয়ে এসে জয়ন্তর বুকে হাত রাখল। বলে—হাঁটুর প্লাস্টার কেন? ফ্র্যাকচার?

—না। বীতশোক মুখটা গম্ভীর করল—বোন টিবি হতে পারে আবার বোন ক্যানসারও হতে পারে।

—ক্যানসার? স্বাতীর গলা কাঁপল।

—হতে পারে। এখনই বলা যায় না।

—কখন যাবে?

—মাস খানেক পর। এক মাস আপনাকে পদসেবা করতে হবে।

নীচের ফ্ল্যাটের যে দুজন ভদ্রলোক কাঁধ দিয়েছিলেন তাঁরা হাসলেন। জয়ন্তকে শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ভদ্রলোক দুজন খাটিয়া নিয়ে নেমে গেলেন।

জয়ন্তর জন্যে ভাবনার মধ্যেই স্বাতীর আর এক ভাবনা। এখন ছুটি পাওয়া যাবে? এক বছর চাকরী না হলে আর্নড লিভ পাওয়া যায়?

বীতশোক স্বাতীর ভাবিত মুখের দিকে তাকাল।

—পারবেন না?

—কী?

—পদসেবা।

—ওটা কোন সমস্যা নয়।

—তাহলে?

—সমস্যা ছুটি নিয়ে। ছুটি পেলে হয়।

জয়ন্ত চুপচাপ স্বাতীর মুখে সান্ত্বনা খুঁজছিল। ছুটির কথায় আর তা খোঁজা হয় না। কঠিন গলায় বলে—না পেলে চাকরী ছেড়ে দেবে।

বীতশোক চোখের দৃষ্টিতে বন্ধুকে শাসন করল। আবার গোঁয়ার্তুমি। স্বাতীকে বলে—চেষ্টা করে দেখুন। না পেলে তো গোপালের মা আছে।

জয়ন্ত খুব আশা করে স্বাতী এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করবে। স্বাতী চুপ। জয়ন্ত কাগজকাটা গলায় বলল—গোপালের মা-ই একমাত্র ভরসা।

স্বাতী কয়েক পলক ভেবে দুঃখের গলায় বলে—সে কথা ঠিক। বাচ্চা হবার সময় দুবারই আমি বাড়িতে একা। তখন গোপালের মা সবদিক সামলায়।

বীতশোক লক্ষ্য করল জয়ন্তর চোখের চাউনি বদলাচ্ছে, মুখের রেখাও নরম থাকছে না। ভয় পায়, চোটপাট না করে স্বাতীর ওপর। পরিস্থিতি সামলাতে স্বাতীকে বলল—আপনি আর বসবেন না। একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন।

স্বাতী বসে নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। বীতশোক

চায়ের কথা বলতেই বেরিয়ে গেল। অফিস থেকে ফিরেই বাথরুমে ঢুকেছিল, চা ওর-ও খাওয়া হয় নি।

গোপালের মা উনুন জ্বেলে রাঁধলেও বাসায় গ্যাসের ব্যবস্থা আছে। স্বাতী গ্যাস জ্বেলে কড়া চাপাল। গোপালের মা চপ গড়ে রেখে গেছে, তা ভাজা হবে এবার।

শোবার ঘরে জয়ন্ত আর বীতশোক কিছুক্ষণ ছ্যাঁকছোঁক শুনল তারপর মুখ খুলেছে নীচু গলায়।

বীতশোক: ওরকম করে বউয়ের দিকে তাকাচ্ছিলি কেন?

জয়ন্ত: ওর চাকরীর কথা শুনলে রাগ উঠে যায়।

বীতশোক: ভেরী ব্যাড। ওর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তোকে সহ্য করতে হবে।

জয়ন্ত: করছি না? এই যে ঘর সাজানো এতো স্বাতীরই। রান্নাবান্না ওর রুচিমাফিক হয়। সিনেমা থিয়েটার ওর ইচ্ছেমত দেখি। বছরে এক আধবার ওর পছন্দমত জায়গায় বেড়াতে যাই।

বীতশোক: এসব ঠিক আছে।

জয়ন্ত: তবে?

বীতশোক: ওই যে বললাম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তোকে ওর ইনডিভিজুয়ালিটি সহ্য করতে হবে। ওর উচ্চাশা, মেলামেশা, ভালো লাগা না লাগা।

জয়ন্ত: দীপংকরের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করিনে।

বীতশোক: কেন?

জয়ন্ত: সে তো তুই ভাল করেই জানিস। তুই-ই তো বলেছিলি স্বাতী ওর দিকে ঝুঁকতে পারে।

বীতশোক: সেজন্যেই তো তোকে সাবধান করতে চাই। একদম আয়ান ঘোষ হয়ে যা। তোর বউ তোরই থেকে যাবে।

জয়ন্ত: তাহলেও ঝগড়াঝাঁটি হবে।

বীতশোক : সে কোন্ সংসারে না হয়? হয়, মিটে যায়। আয়ান ঘোষের সুখের সংসার ছিল, তোরও থাকবে।

জয়ন্ত : থাকবে না। কারণ রাধা চাকরী করত না। অর্থনৈতিকভাবে স্বামীর সম্পুর্ণ অধীন ছিল।

বীতশোক : তুই আমার ই'য়ে জানিস। রাধারও দুপয়সা রোজগার ছিল। বৃন্দাবনের হাটে ভালই বিক্রী করত দুধ দই ওটা কোন কথা নয়।

জয়ন্ত : তা আমাকে কী করতে হবে?

বীতশোক : লেট হার ফিল ইমপর্ট্যান্ট। তুই যেমন নাম যশ এপ্রিসিয়েশন চাস, ও-ও তেমনি চায়। তোর কাছে এপ্রিসিয়েশন পায় না তাই দীপংকরের কাছে যায়।

জয়ন্ত আর কিছু বলল না। ভাবছে। তাহলে আমার প্রতি স্বাতীর ভালবাসা কোথায়?

স্বাতী কোমর নুইয়ে চপের প্লেট নামাল। বসন ভেদিয়া রূপ ওঠে গিয়া যেমন তড়িত দেখি। আগুনের কাছে ছিল, মুখে রক্তিম আভা। বলল—খান। সস লাগবে?

বীতশোক বলল—না। খিদের মুখে ওসব কিছু লাগবে না।

স্বাতী চা আনতে গেলে জয়ন্ত বলল—চাকরী করতে বেরিয়ে আরও সুন্দর হয়েছে। তাই না?

বীতশোক ঘাড় কাত করল।

*

রাত আটটা। অনেকক্ষণ বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে গল্প হয়েছে, বীতশোক উঠি উঠি করে কিন্তু উঠতে পারে না। বাড়ি ফিরলে তো চাপদাড়ি রহমৎ। বুক শেলফের দিকে তাকিয়ে বলে—মিসেস রায়, আপনার তো বেশ বই পড়ার সখ!

—আমার কী করে বুঝলেন?

—জয়ন্তর বইপড়া অভ্যেস নেই।

—বইগুলো কিন্তু ও-ই কিনে দিয়েছে। স্বাতী জয়ন্তর দিকে তাকাল। আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বিকল করিল তারে।

জয়ন্ত বোকার মত দাঁত বের করে হাসে। বীতশোক মুখ তুলে স্বাতীর চোখে চোখ রাখল—সুভাষ বোস না কে যেন বলেছিল, বই ছাড়া বাড়ি আর মন ছাড়া শরীর একই।

স্বাতী কৌতুকের গলায় বলে—আমাদের অফিসে মিনি বলে একটা মেয়ে আছে। সে একদিন আমাকে ধরল—স্যাটি, য়ু উইল চুজ আ বুক ফর মি। দোকানে ঢুকে ভাবছি, কার লেখা মিনির পছন্দ, ও র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে বলল—

স্বাতী দুলে দুলে হাসছে, আঁচল খসে যায়। উন্নত উরজ চীরে ঝাঁপএ পুনু দরশা এ। ও যথাসম্ভব সামলে সুমলে বসল। মুখের হাসিটুকু মুছে যায় নি। বলল—কী কাণ্ড মিনির! বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, আমার ঘরের পরদা সোফাসেটের ঢাকা বেড-কভার সব লাল, দ্যাখো তো এই স্কারলেট রেড মলাটের বইটা মানাবে কিনা!

—দারুণ! বীতশোক হেসে উঠল। জয়ন্ত বলে—বিদুষী মিনিকে দেখতে তোমার অফিসে একদিন যেতে হয়।

স্বাতীর মুখের হাসি এবার মুছে যায়। সুন্দরি অবহু করয় মান : স্বাতী অভিমানের গলায় বলল—তুমি আমার অফিসে আজ পর্যন্ত একদিনও আসো নি।

জয়ন্ত বলতে যাচ্ছিল, তুমিও আমার অফিসে আসো নি, বলল না। স্বাতীর মান ভাঙতেই যেন বলল না। চুপ করে রইল। প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানম্ নিদানম্।

*

এখন গভীররাত। স্বাতীর শরীরের ঘ্রাণ পেতে জয়ন্তর ইচ্ছেটা এসে যায়। ও একটা হাত আলতোভাবে স্বাতীর বাহুমূলে রাখল।

পেলবতা পরীক্ষা করে। এ হল মিথুনচর্চার ভূমিকা। খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে, স্বাতীর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

হাঁটু প্লাসটার করায় জয়ন্ত স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ। স্বাতী বলে—তোমার হাঁটুতে যে ব্যথা।

—ফুটবলার হওয়ার পরিণাম। জয়ন্ত পাশ ফেরার চেষ্টা করে, পারে না। মনে পড়ে এসপ্লানাডে দেখা সস্ত্রীক ভদ্রলোককে। শক্ত সমর্থ পুরুষ ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এক পা কাটা। বলে—আমার যদি পা কাটা যায়, তুমি আমাকে ঘেন্না করবে?

—না গো! স্বাতী শরীরের নরম চাপ দিল—তা কী কোন স্ত্রী পারে?

জয়ন্তর চোখে নির্ভরতার আনন্দ উপচে পড়ল। এ আনন্দের তুলনা নেই।

স্বাতীর রেখাদিকে মনে পড়ে। তাঁর স্বামীরও এক পা কাটা। রেখাদিকে বাঁচাতে গিয়ে ভদ্রলোকের এই অবস্থা। ব্যারাকপুরে রেললাইন পেরোতে গিয়ে রেখাদি পড়ে গিয়েছিলেন, উনি প্ল্যাট-ফরম থেকে নেমে ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে সরিয়ে দেন। বেরিয়ে আসার সময়ই একটা ট্রেন এসে পড়ে।

স্বাতী রেখাদির স্বামীর পত্নীপ্রেমের কথা ভাবতে থাকে। ভদ্রলোক জীবন তুচ্ছ করে এগিয়েছিলেন।

*

সকালে জয়ন্ত ঘরেই রয়েছে। এ অবস্থায় তো মাঠে প্র্যাকটিস করতে যাওয়া সম্ভব নয়। চা খেয়ে কাগজে চোখ বোলায়।

স্বাতী দোরগোড়া থেকে উঁকি মারল।

—কিছু চাই নাকি?

—চাই।

—কী?

—তোমাকে। জয়ন্ত অনুনয়ের গলায় বলল—বোসো, একটু গল্প করি।

এখন গল্পকরার সময় নয়, তবু স্বামীকে খুশী করতে বসল। জয়ন্ত দুঃখের গলায় বলে—তোমার স্পোর্টিঙ ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা মনে পড়ে?

—পড়ে। ওই খেলাতেই তোমার হাঁটুর মালাইচাকি খুলে যায়।

—হ্যাঁ। কিক অফের পর বল নিয়ে ছুটছিলাম, ইউনিয়নের দুজন স্টপার আটকাল। একজনকে ড্রিবলিঙ্ করে কাটাতে অপরজন ল্যাঙ মারল।

স্বাতীর চোখের সামনে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। তখন ও আইবুড়ো সরা। দাদার সঙ্গে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছিল। জয়ন্ত যখন হাঁটুমুড়ে পড়ে যায় তখন ও কেঁদে ফেলেছিল।

৯

অফিসে এসেই স্বাতী ছুটির দরখাস্ত লিখতে বসল। সুলতার কৌতূহল সকলের চেয়ে বেশী। উঁকি মারছে—কী ব্যাপার?

স্বাতী ব্যাপার বলতে সুরু করলে মিনি, কাজল উঠে এল। কাজল বিরক্তির গলায় বলে—খেলার নেশা সাংঘাতিক। হাত ভাঙ্গছে পা ভাঙ্গছে তবু খেলা চাই।

—চাই না? মিনি করতল চিৎ করে—কলকাতার মাঠ থেকে খেলা উঠে যাবে?

কাজল জবাব করতে পারে না। একটু ভেবে বলল—যারা খেলবে তারা ব্যাচিলার থাকবে।

মিনি হেসে উঠল—হোয়াই?

স্বাতী চোখ তুলে তাকায়; যেন কিছু বলবে। তার আগেই কাজল বলে—এই যে জয়ন্তবাবু হাঁটু নিয়ে শুল; এখন যদি খারাপ কিছু হয়, তাহলে স্বাতী কী করবে?

এবার মিনি চোখের কোণে রেখাদির দিকে তাকায়। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু দৃষ্টি খুবই অর্থবহ। কাজল তার সীটে ফিরে গেল। মিনি সুলতা এরাও আর দাঁড়াল না। দরখাস্ত লিখে স্বাতী বড়-বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

—ছুটি চাই। এক মাসের।

—এক মাস!

—যদি উনি সুস্থ থাকেন, আগেই জয়েন করব।

—সেই ভাল। আট দিনের পর উইদাউট পে। নিবারণ দরখাস্তখানা নাড়াচাড়া করেন—আপনার কাজটা কাকে দি বলুন তো?

স্বাতী যেন ভেবেই রেখেছিল। বলে—অভ্রকুমারকে দিন।

—করবে? এক্সট্রা রেমুনারেশন কিন্তু পাবে না।

—তাহলেও করবে।

নিবারণ আওয়াজ দিতে অভ্র উঠে এল। পাঁচ সেন্টিমিটার ঠোঁট ছড়ায়।

—বলুন।

—লবঙ্গ ফুরিয়েছে। নিবারণ পকেট হাতড়ে টাকা বের করলেন—পাঁচ গ্রাম একটাকা। নিয়ে এস।

দশ মিনিটে অভ্র পুড়িয়া নিয়ে হাজির। নিবারণ একটা মুখে দিলেন—ওজন দেখে নিয়েছ তো?

—তা আবার নিই নি? ওজন নিয়ে দোকানীর সঙ্গে ঝগড়া করে এলাম।

—ঝগড়া? নিবারণ চোখ সরু করেন—দাঁড়ি মারছিল?

—ঠিক তা নয়। লবঙ্গ'র ওপর মাছি বসেছিল। দুটো মাছি মানে একটা লবঙ্গ। মানে পাঁচ পয়সা। মাছি উড়িয়ে ফের ওজন করালাম।

নিবারণ কুবকুব করে হাসলেন। মনের গভীরে বলেন—ছেলেটা বড় ভাল। পরোপকারের অভ্যেসটা আছে।

অভ্র লিখে দিল, বাড়তি কাজের জন্যে কিছু দাবী দাওয়া করবে না।

*

এখন টাইপিস্টরা যে যার চেয়ারে। মিনি, রেখা, কাজল, সুলতা সকলেই। পিওন ত্রস্তপায়ে টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরছে। ব্যস্ত হাতে কুড়োয় টাইপ করা চিঠি, পে বিল, ভাউচার।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা টাইপ করার পর স্বাতী হোঁচট খেল এণ্ট্রপ্রেনার্স শব্দটায়। কেটে লেটার বাই লেটার সাবধানে টাইপ করল। তারপর ঝড়ের বেগে হাত চলে। আঙুলগুলো স্বচ্ছন্দ

বিচরণ করছে লেটার হেডের ওপর। শেষ চিঠিটা ধরেছে কাজল বলল—নাও এবার ওঠ।

—এক মিনিট ভাই।

—জরুরী চিঠি তো না। লাঞ্চ ইণ্টারভ্যালের পর হবে।

কাজল একরকম জোর করেই স্বাতীকে ওঠাল। নিবারণ বাইরে গেলেন। মিনি বলে—এ চেয়ারে যে বসে সেই বড কাজের হয়। তুমি তিতিরের মতই।

—যা বলেছ। স্বাতীও স্টেনো হবে। সুলতা ব্যাগ কাঁধে ঝোলায়।

স্বাতী, কাজল ও সুলতা বাথরুম ঘুরে এল। চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসলে রেখাদি স্বাতীর চোখে চোখ রাখেন—বণ্ড সই করবে নাকি ?

—ভাবছি। স্বাতী কেমন থিতিয়ে গেল—আপনি কী বলেন রেখাদি ?

—এসব ব্যাপার নিজেই ঠিক করতে হয়। তোমার যদি চাকরীর প্রয়োজন থাকে নিশ্চয় করবে। কয়েক পলক ভেবে বয়সিনী রেখাদি আস্তে আস্তে বললেন—চাকরী করার ছ্যাপা তো কম নয়। বাসট্রামে পেষাই হয়ে আসা, এর ওর মন জুগিয়ে চলা। দেরী করে এলে কৈফিয়ৎ, আউটটার্ন কম হলে কৈফিয়ৎ।

—তবু তো আপনি করছেন।

—তা করছি। রেখাদি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—আমার স্বামী পঙ্গু। তাঁর রোজগার নেই। আমি চাকরী না করলে দুজনই উপোস দিয়ে মরব।

সকলের মন খারাপ হয়ে যায়। সব চেয়ে বেশী স্বাতীর। খেয়াল থাকলে কখনই ও চাকরী করার কথা বলত না। কদিন বড় ভুল হচ্ছে। ক্ষমা চায়।

অভ্র হাতমুখ ধুয়ে ফিরল।

—আজ কী হবে?

—লুচি আলুর দম আর রসগোল্লা। রেখাদি পয়সা দিলেন।

এ মাসে রেখাদি ম্যানেজার। টাকা পয়সার হিসেব রাখেন, মেনু ঠিক করেন, অভ্রকে দোকানে পাঠান। ও বারোমাসই বাজার-সরকার। এই প্রথায় সকলেই খুশী মিনি ছাড়া। ওর নাকি বাইরে খেতে ভীষণ ভাল লাগে।

মিনি স্বাতীর দিকে তাকাল—তোমার হাবি বোধ হয় এ সীজনে খেলতে পারবে না।

—কে জানে, হয়ত খেলাই বন্ধ।

—ভেরী স্যাড্। এখনও চার পাঁচ বছর অনায়াসেই খেলতে পারতেন। ফর্ম ভালই ছিল।

স্বাতী চুপ করে রয়েছে। জয়ন্ত খেলতে পারবে না এ নিয়ে তেমন দুঃখ নেই। এই স্বাতী একদিন টেণ্টে, গ্যালারীতে কত হৈ চৈ করেছে। পেলে, লেভ ইয়াসিন, ববি চার্লটন। চুনী, হাবিব, জয়ন্ত। আজ আর ভাল লাগে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায়, স্বাতীও বদলেছে। এখন ওর ধারণা, খেলাটা একান্তই জয়ন্তর নিজস্ব ব্যাপার। ও নিয়ে ওর মাতামাতি করার মানে হয় না। তখন বয়েস কম ছিল আর নিজস্ব কাজ ছিল না তাই করেছে। তাই বলে স্বাতী নিষ্ঠুর নয়। জয়ন্তর কথাও ভাবে। খারাপ যদি কিছু হয় তাহলে জয়ন্ত উপোস দেবে না। রেখাদির মত চাকরী করে স্বামীকে খাওয়াবে। বণ্ড সই করার চিন্তা স্বাতীকে পেয়ে বসল। করলে পাঁচ বছর এখানেই পড়ে থাকতে হবে। দীপংকরের অফিসে জয়েন করতে পারবে না। সেটা ভাল হবে? ও অফিসে স্টেনোর স্কেল তিনশো-সাড়ে পাঁচশো। এখানে আড়াইশো-সাড়ে পাঁচশো। স্টার্টিং পে পঞ্চাশ টাকা কম। মসৃণ কপালে চিন্তার রেখা ফোটে।

*

সাড়ে তিনটের সময় ম্যানেজারের পিওন এল। মিসেস স্বাতী রায়কে সায়েব সেলাম দিয়েছেন।

স্বাতী চিন্তিত মুখে বড়বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

—ডাকছেন কেন ?

—আপনার ওপর সায়েবের নেকনজর। ছুটির দরখাস্ত পেয়ে দেখার ইচ্ছে হয়েছে।

স্বাতী লজ্জায় চোখ নামাল। নিবারণ বললেন—আপনাকে তো আগেই বলেছি, এ সাদাকালোর জগৎ, এখানে রংয়ের কারবার নেই। কাজের জন্যে পছন্দ করেন। যান, দেরী করবেন না।

ধীর পায়ে চলেছে। রংয়ের কারবার থাক আর না থাক স্বাতী সহজ হতে পারে না। বুকটা কাঁপে। সুইংডোর ঠেলে ঢুকল।

—গুড আফ্টার নুন, স্যার।

—গুড আফটার নুন। রাজেশ কালো শেলের ভারী চশমা খুলে তাকাল—আমার কথা মনে আছে ?

—আছে।

—এখনও ভাবছেন ?

—ইয়েস স্যার।

—ছুটি থেকে ফিরলে আমাকে জানাবেন। রাজেশ দৃষ্টি স্থির করল—বসুন। একটা কাজের কথা বলব।

স্বাতী আঁচল সামলে বসল। সিনথেটিক শাড়ী মসৃণ কাঁধ বেয়ে কেবলই গড়িয়ে যায়।

রাজেশ বলে—শর্টহ্যাণ্ড রপ্ত করছেন ?

—করছি।

—পরীক্ষা করব ?

—করুন।

—ভেরী গুড। রাজেশ শব্দ করে হাসল—কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসুন ওপাশ থেকে।

স্বাতী ডিকটেশন নিতে বসলে রাজেশ চোখে চশমা দিল। প্রথম চিঠিটা হলে বলে, ক্যান আই ডিকটেট ফাস্টার? স্বাতী মাথা হেলিয়ে দিল। তৃতীয় চিঠিটা হলে একই প্রশ্ন করে আর স্বাতী মাথা হেলিয়ে দেয়। খুশীর গলায় রাজেশ বলে—য়ু আর রিয়ালি ওয়াণ্ডারফুল।

স্বাতী পুলকিত বোধ করে। এমনটি আগে কখনও বুঝি করেনি। বিগত আট বছরে তো নয়ই।

*

মনে সুখ থাকলে যা হয়। কখন যে পাঁচটা বাজে স্বাতী টেরই পায় না। ছুটি হতে চিরুনিপাতা গাছতলায় দাঁড়াল। দীপংকরকে বলবে, রাজেশ সায়েব হায়ার স্টার্টিং পে মানে তিনশো দিতে রাজী।

পড়ন্ত বেলার রোদ গায়ে এল দীপংকর। ওরা দুপা হেঁটে গিয়ে বসল রেস্তরাঁয়। স্বাতী সাধারণতঃ কম কথা বলে, আজ কথা আর শেষ হয় না।

দীপংকর মনের গভীরে হাসল। স্বাতী সেই জাতের মেয়ে যারা নিজের ইচ্ছেয় চলতে চায়। আর পারেও। গোয়ালিনী রাধা। এদের জাতই আলাদা। বলল—মাইনে দু অফিসে সমান। তোমার যেটা পছন্দ।

—কোন্ অফিস ভাল?

—আমাদের অফিসে তুমি আরও উন্নতি করবে। দীপংকর ফিলটার কিং ধরাল—দেখি তোমার হাতটা।

দীপংকর অবসর সময় কিরো আর মেয়েদের হাত নাড়াচাড়া করে। রমার, রীতার, মিতুলের, ময়নার করেছে। আজ আবার স্বাতীর করছে। হস্তবিশারদ মুখটা গম্ভীর করল ফুটপাতের পেশাদারদের মতই। এটা ও ভালই পারে।

স্বাতীর অস্বস্তি হয়। যদিও হাত দেখা পা দেখায় তেমন

বিশ্বাস নেই তবু একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না। কারণ দুবার ফলেছে ভবিষ্যৎবাণী। দীপংকর বলেছিল, ওর চাকরী হবে আর জয়ন্তর খেলা যাবে। স্বাতী অধীর গলায় বলল—দীপ, গম্ভীর কেন ?

—ভয়ে বলব না নির্ভয়ে ?

—সাসপেন্স দেবে না। চটপট বলে ফেল।

—এটা চটপট বলার নয়।

—আবার! স্বাতী কিল দেখাল—মার খাবে।

—আমার তো ওই রকমই কপাল। জয়ন্ত মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল, তুমিও দাও।

স্বাতী কুলকুল করে হাসে।

দীপংকর মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকে। জয়ন্তকে ভোগা দিতে হলে স্বাতীই উপায়। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। বেশ আন্তরিকতার গলায় বলে—সই, তোমার হাতে বিবাহ বিচ্ছেদের যোগ রয়েছে।

—ডিভোর্স ?

—হাঁ। ডিভোর্স কী আজকাল হচ্ছে না ? আজকার কাগজেই দেখ না। বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকার মামলা এখন শুধু আলিপুর আদালতেই দৈনিক দুটো হচ্ছে।

স্বাতী ভাবনার জলে ডুবে যায়। কানের দুপাশে কেমন একটা সোঁ সোঁ শব্দ। কিছুই শোনা যায় না। অদৃশ্য কী এক টানে নামছে কিন্তু তলিয়ে গেল না একেবারে। ভেসে উঠল। বুক ভরে শ্বাস নেয়। বলে—ওসব কথা থাক। আমার মন ভাল নেই। জয়ন্তর বোনে টিবি হয়েছে। ক্যানসারও হতে পারে।

— কে বলেছে ?

—ডাক্তার বীতশোক ব্যানার্জি।

—বাজে কথা। ও তুমি বিশ্বাস কর ?

স্বাতী হাঁ-ও বলতে পারে না না-ও বলতে পারে না। সন্দেহই তো। মৃদুস্বরে বলল—মাসখানেক পর প্লাস্টার কাটা হবে, এক্সরে হবে আবার। তখন সঠিক জানা যাবে।

দীপংকর চোখ সরু করল। যারা হাত দেখে অনেক কিছু জানতে পারে তারা মুখ দেখেও কিছু কিছু টের পায়। বলে—তোমাকে জয়ন্ত ছুটি নিতে বলে নি ?

—বলেছে।

—ছুটি না পেলে চাকরী ছাড়তে বলে নি ?

—হাঁ। তাও বলেছে। স্বাতীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ডাগর চোখ মেলে তাকায়। দীপংকর গাঢ়স্বরে বলে—সই, জয়ন্ত গোঁয়ার গোবিন্দ। টিবি টাবির ছল ওর মাথায় আসবে না। এসব বীতশোকের বুদ্ধি। দা বাস্টার্ড তোমাকে আবার শেকলে বাঁধতে চায়। অর্থনৈতিক পরাধীনতার শেকল ' যেমন চাট্টি চাট্টি খেতে আর সতীত্বের বুলি বলতে তেমনি বলবে, এই ও চায়।

শুনি ধনী কেঁপে উঠল।

১০

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। জয়ন্তর হাঁটু বীতশোক ও আরও একজন ডাক্তার পরীক্ষা করেছে। যা ভেবেছিল তা নয়। ভয়ের কিছু নেই। ইচ্ছে করলে ও খেলতে পারে।

এদিকে লীগের খেলা সুরু হয়েছে। আসছে সপ্তাহে ইস্টার্ন রেল বনাম ওয়ারি।

অফিসে এসে জয়ন্ত অ্যাটেণ্ডান্স রেজিস্টার অফিসারের কাছে পাঠাল, ডাক দেখল, জরুরী চিঠি ক'টা সহকারী মনীশের হাতে দিল। তারপর ঘুরে ঘুরে সেকশনের সকলের সঙ্গে আলাপ করে।

—টুপুস, তোমার বিয়েতে যেতে পারিনি। একদিন নেমন্তন্ন কর, কবজি ডুবিয়ে মাংস খেয়ে আসি।

—করলাম। কমবয়েসী মেয়েটা মুখ উজ্জ্বল করে হাসল—খেলার পর মাঠ থেকে সোজা চলে আসবেন মনীশকে নিয়ে।

খুশ মেজাজে জয়ন্ত কয়েক পা এগিয়ে মনীশের সামনে দাঁড়াল। মনীশ বলে—জয়ন্তদা, বিয়েতে আমি কম সে কম তিরিশ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি।

—কী করে?

—কাঁচাবাজারে। জানেন তো গ্রীষ্মকালে মারবেল সাইজ পাতি-লেবু দুটোর দাম একটাকা। টুপুস দরদাম করে আশী পয়সায় ঠিক করেছে, আমি ওকে ফলের দোকানে নিয়ে গেলাম। মারবেল সাইজের কমলালেবু টাকায় বারোটা। পাতিলেবুতেই দশটাকা সেভিং।

জয়ন্ত নিজের চেয়ারে এসে বসল। অনেক দিন পর অফিস এসেছে ভালই লাগছে। ঢাকা খুলে জল খেল।

মনীশ চিঠি দেখতে দেখতে বলে—জয়ন্তদা, আমার খেলা দেখতে যাওয়া হবে না।

—কেন ?

—দেখেশুনে মাংস কিনতে হবে তো! আমি বাজার করে রান্না বসিয়ে দেব। আপনি টুপুসকে নিয়ে চলে আসবেন। দেখবেন মাংস তৈরী।

জয়ন্ত মুখটা করুণ করে বলল—মনীশ, তুমি মাংস কিনলে আমি খাব না।

—অপরাধ ?

—তুমি নির্ঘাৎ কুকুরের মাংস কিনবে।

টুপুস খিলখিল করে হাসল। হেসে বলল—জয়ন্তদা ঠিক বলেছেন।

টুপুসের কথায় এবং বলার ধরনে এমন একাত্মবোধের সুর ছিল যে, জয়ন্ত চমকে ওঠে। মনে পড়ে ঋতুকে। সে-ও এমনি করে হাসত। মা বোন পর্যন্ত মেয়েরা বেশ। যত গোলমাল বউ নিয়ে। ইনডিভিজুয়ালিটি, পার্সন্যালিটি কত কী!

*

জয়ন্ত এস্টিমেটের ক্যালকুলেশন অফ ভ্যালুস অ্যাণ্ড ওয়েটস সীটটা চেক করছে, পিনাকী সেন ডেকে পাঠাল।

—তোমাকে খেলাতে নামাব জয়ন্ত। কিপ য়ুওরসেলফ ফিট। হাঁটু কেমন আছে ?

—ভাল। কয়েক পলক ভেবে জয়ন্ত মুখ খুলল—শুনছি, আমাকে নাকি রিজার্ভ রেখেছেন। এক্সট্রা ?

—হাঁ। চোট খাওয়া হাঁটু তো, পুরো খেলা ঠিক হবে না। হাফ টাইমের পর নামাব। পিনাকী হাতের কাজে মন দেয়।

জয়ন্ত যথাসম্ভব নরম গলায় ডাকল—স্যার!

—কী? পিনাকী মুখ না তুলেই বলে।

—ফাস্ট হাফে আমাকে কি নামানো যায় না ?

—না।

—কেন ?

পিনাকী সেন মাঠে ফুটবলারদের সঙ্গে মেলামেশা হাসিটাট্টা করে। তাই বলে ভুলে যায় নি ও ক্লাস ওয়ান অফিসার। একজন সুপারভাইসারের 'কেন' পছন্দ হল না। মুখ তুলে তাকাল। দৃষ্টি স্থির রেখে বলে—তুমি এখন যেতে পার।

জয়ন্ত অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। মুখ কালো করে তার সেকশনে ফিরে এল। ঠিক আছে ও হাফটাইমের পরই খেলবে। দেখাবে, জয়ন্ত রায় এখনও মরে নি। তাকে একস্ট্রা করা অন্যায়।

টুপুস যেন জয়ন্তর অপেক্ষায়ই ছিল, বলে—কী হল জয়ন্তদা ?

—কিছু না।

—না, কিছু একটা হয়েছে। বলুন।

—শেষমেষ এক্সট্রা ! হাফটাইমের আগে পর্যন্ত জার্সি গায়ে সাইড লাইনে বসে থাকব।

—তারপর ? টুপুস আবেগের গলায় বলে—মাঠ কাঁপিয়ে দেবেন।

জয়ন্ত চুপ করে রইল। বুকের ভেতর গুরু গুরু আওয়াজ দেয়। জরুর, জরুর, জরুর। সহসা পিনাকী সেনের গলা, সেই আওয়াজ ছাপিয়ে ওঠে : কটা বল রিসিভ করতে পার নি ?··· কটা অফসাইড করেছ ?···কটা ওপেন নেট ছেড়ে বাইরে মেরেছিলে ? যখন জয়ন্ত চোখ মুখ কুঁচকে মানসিক যন্ত্রণা সামলায় তখনই পিনাকী ওস্তাদের মার মারে : আই সে জয়ন্ত, জি. এম. ইজ ড্যামড্ অ্যানয়েড উইথ য়ু। টেক কেয়ার। জেনারেল ম্যানেজার বিরক্ত, একথা বুকের ভেতর শব্দিত হলে অতি বড় সাহসী চাকুরেও ভয় পায়। জয়ন্ত সিটিঁয়ে গেল। শুকনো গলায় বলে—টুপুস, সে ক্ষমতা আমার আর নেই।

*

ছুটি হলে জয়ন্ত অলস পায়ে হেঁটে এসে বীতশোকের বাড়িতে উপস্থিত। ভূলুণ্ঠিত সিংহের ধূলি ধূসরিত অবয়ব রুমাল বের করে ঝেড়ে দিল। তখন পশুরাজ অবাক করে কথা বলে। জয়ন্ত শুনতে পায়, জবাবও দেয়।

সিংহ— বেশ তো আছি। ঝাড় পোছ কেন?

জয়ন্ত—খারাপ দেখাচ্ছিল তাই।

সিংহ—আমাকে আবার কে দেখছে?

জয়ন্ত—কত মানুষই তো এখানে আসে।

সিংহ—তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। তুমিই যা আলাদা।

জয়ন্ত—আলাদা?

সিংহ—হাঁ। বেচাল! পাঁচজনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পার না। খেয়াল খুশীমত চল। স্বভাব বদলাও, না হলে কপালে কষ্ট আছে।

বীতশোক দোতলার বারান্দা থেকে ডাকল। জয়ন্ত শুনতে পায় না। স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর চোখের পলক পড়ল, কানে কথা গেল। বেচাল লোকটা ভাবতে ভাবতে উঠে আসে। ঘরে বাইরে অশান্তি আর সহ্য না।

জয়ন্ত বসলে বীতশোক বলল—কেমন আছিস?

—ভাল না। প্রায়ই মাথাটা কেমন করে।

—ও কিছু নয়। ইট, ড্রিংক অ্যাণ্ড বী মেরী।

বীতশোক প্যাড টেনে এক লাইন লিখল। তারপর কাগজটা ছিঁড়ে হাত বাড়ায়—নার্ভ টনিকটা খাবি। বউয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলবি। অফিসে বসের তোয়াজ করবি। দেখবি মাথা কেমন করবে না।

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তুই বেশ আছিস। মুক্ত পুরুষ।

—মুক্ত পুরুষ? মুক্ত পুরুষ কেউ এখনও কি আছে? সাধু

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে দেখবি খাওয়া থাকা ব্যাপারে তারাও পরাধীন, তাদেরও বন্ধন আছে।

—ও বন্ধন কিছু নয়।

—তুই কী বাহুলতার বন্ধনের কথা বলছিস ?

—হ্যাঁ।

—ভেরী স্যাড। বীতশোক কয়েক সেকেণ্ড ভাবল। তারপর গভীর গলায় বলে—বার্নার্ড'শয়ের সুপারম্যান স্ত্রীর বাহুলতা দেখে আঁতকে উঠেছিল—দা বোয়া কনস্ট্রিকটার। তা তুই তো আর সুপারম্যান নোস। তোর কাছে সুখেরই হওয়া উচিত স্বাতীর বাহুলতা।

—হচ্ছে না।

—তুই তোর খেয়াল খুশীমত চলিস তাই।

—তাই নয়।

— তবে ?

—স্বাতী বোধ হয় দীপংকরকে চায়। তুই ঠিকই বলেছিলি, আ উয়োম্যান ইজ নেভার টু ওল্ড টু বী টাচড্ বাই দা ফেথফুলনেস অফ অ্যান ওল্ড লাভার।

বীতশোক আকাশপানে চেয়ে রইল। স্বাতী দীপংকরকে চায়। চাইতেই পারে। জয়ন্তকে বিয়ে করেছিল ঝোঁকের মাথায়। ভেবেছিল, একজন নামী ফুটবলারের স্ত্রী হওয়া বড় সুখের। মাঠে গেলে কত লোক ছুটে আসে। টেণ্টে হৈচৈ পড়ে যায়। সে সব যখন ফুরোল তখন শুধু হতাশা। এই হতাশাই স্বাতীর সুখের ধারণা বদলে দিয়েছে। খুব ধীরে ধীরে বলে—বিবাহ বিচ্ছেদ যে হচ্ছে না তা নয়। তবে স্বাতী বোধ হয় অতখানি এগোবে না। অভ্যেস, সংস্কার এসবও তো আছে। সে যা হোক, তুই হঠকারী কিছু করবি না।

—দীপংকরের সঙ্গে ইনটিমেসি অসহ্য। ও আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

—খুব পারবি। পাঁচজন যা পারে তুই তা পারবি না কেন? অতীনের কথা ভাব তো। ওর কী রীতার জন্যে কম ঝামেলা? কিন্তু কেমন সাবলিমেট করতে পেরেছে।

জয়ন্তর মুখে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায়।

বীতশোক গলা চুলকে বলল—এখানে পাখা নেই। গরম লাগছে। ঘরে চল।

—না! আমি যাই।

—কোথায় যাবি? টেণ্টে?

—হাঁ। আসছে সপ্তাহে আমার খেলা, মাঠে আসছিস তো?

বীতশোক ঘাড় কাত করল।

*

উঠতি ফুটবলার ভাস্কর মিত্তিরকে দীপংকর ভিজিয়েছে। অবশ্যই মিষ্টি কথায় নয়। সে টেণ্টে বসে খুব রোয়াব নিচ্ছে।

—জয়ন্তকে নিয়ে আর চলে না। রাজগঞ্জের সঙ্গে খেলা মনে আছে? খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে রাজগঞ্জের বাদল বল নিয়ে উঠে আসে। জয়ন্ত আর কুমার তখন পেনাল্টি এরিয়া লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে। বাদলের পা থেকে আমি বল কেড়ে নিয়ে তীব্রগতিতে এগিয়ে যাই তারপর ডান দিকে ঠেলে দি। অব্যর্থ পাস। বল পেয়ে লিঙ্কম্যান শট করে। জয়ন্ত পিছিয়ে এসেছিল, বল ওর পায়ে। তখন যদি অন্যমনস্ক না হত, রাজগঞ্জের ব্যাক চার্জ করার সময়ই পেত না এবং আমরা একটি অনবদ্য গোল করে টু পয়েণ্ট পেতাম।

জয়ন্ত টেণ্টে ঢুকে শেষের কথাগুলো শুনতে পায়। নির্লোম ভুরু কোঁচকাল।

—কোন্ অনবদ্য গোলের কথা বলছিলে ভাস্কর?

—রাজগঞ্জকে যেটা দেওয়া উচিত ছিল।

—কার?

—আপনার।

--কেমন করে ?

—বল পাওয়া মাত্র আপনার শট করা উচিত ছিল।

—ওখান থেকে শট নিলে গোল হত না।

—স্ট্যামিনা থাকলে ঠিক হত। ভাস্কর ঠোঁট ছড়াল—আপনি ভয় পেয়েছিলেন না অন্যমনস্ক ছিলেন ?

জয়ন্তর ঘাড়ের ওপর টিপ টিপ ব্যথা করে। মেজাজ সামলে বলল—ভয়ও পাইনি অন্যমনস্কও ছিলাম না।

—তাহলে স্কিল দেখাবার লোভ ? একটু ড্রিবল করার ইচ্ছে কি হয়েছিল ?

—তার দরকার ছিল ভাস্কর। ব্যাককে কাটিয়ে না উঠে স্ট্রাইক করা যায় না।

ভাস্কর চুপ করে গেল। তবু একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যায়। পেছন থেকে বরুণ বলল—আমরা কিন্তু অন্যরকম শুনেছি।

—কী শুনেছ ? জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়ায়।

চাপা হাসির শব্দ। জয়ন্তর সেই ব্যথা প্রবল হয়। চিৎকার করে বলল—বাপের ব্যাটা হোস তো বলবি, কী শুনেছিস।

বরুণের মাথায়ও খুন চড়ে যায়। বলে—রাজগঞ্জের কাছে টাকা খেয়েছিলেন।

জয়ন্ত বাঘের মত বরুণের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তিন চার জন মিলে ছাড়াতে পারে না। দুজনই সমান। জয়ন্তর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে। সে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়।

*

খাবার টেবিলে জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে বসে থাকে। দুঃখগুলো এমন অন্যায়ের পথ ধরে আসে। সেদিনের ছেলে বরুণ মুখের ওপর বলে কিনা টাকা খেয়েছেন। এও শুনতে হল। আরও কত কী শুনতে হবে কে জানে।

স্বাতী কাটা ঠোঁটের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল—কোথায় গুণ্ডামি করে এলে?

—তুমি তো সব সময় আমাকে গুণ্ডামি করতেই দেখছ।

—করছ, তাই দেখছি।

—কবে করলাম?

—মনে করে দেখ।

—আমার তো মনে পড়ছে না।

—দীপংকরের বাড়িতে গুণ্ডামি করো নি?

জয়ন্ত ঠোঁট চাটল। রক্তের নোনা স্বাদ পেতে চনমনে ভাবটা এসে যায়।

—করেছিলাম। আর একবার করব!

—এমন না হলে ভদ্রলোক!

—আমি আর ভদ্রলোক হতে পারলাম কই। ঘুষ নিতে শিখলাম না। ফিলানডারার হতে পারলাম না।

স্বাতী বিদ্রূপের ভঙ্গী করে বলল—মন্দটাই দেখলে। ভালটা দেখলে না। দীপংকর ভদ্র, মিশুক, লক্ষ্মীমন্ত।

—আর প্রশস্তি গাইতে হবে না। দয়া করে চুপ কর। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

স্বাতী শোবার ঘরে চলে গেল।

খাটের বাজু শক্ত করে ধরে নিজেকে সামলায়। শ্বাস খাটো হয়ে আসে। কলজের এ ঘর থেকে ও ঘরে রক্ত লাফিয়ে পড়ে। বিছানায় গা এলিয়ে বাঁধনগুলো আলগা করে দিল। তারপর মনে মনে জয়ন্তর সঙ্গে বোঝাপড়া করে। যে লোক শুধু নিজের কথাই ভাবে তার জন্যে কেন ওর মন কাঁদবে? এই যে গুণ্ডামি করে বাড়ি ফিরল সে কী ওর জন্যে? জিজ্ঞেস করা হল, তা কী মেজাজ! মনের ইচ্ছে, মুখ মুছিয়ে ডেটল লাগিয়ে তোয়াজ করুক। অনেক করেছে। খেলে ফিরলে ম্যাসাজ করে দিয়েছে; টেংরির স্টু খাইয়েছে। জিতলে

খুশিতে আটখানা হয়েছে। আর হারলে মুখ ভার করেছে। ফুটবলারের স্ত্রীকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সে সবই। আর না। এবার ও নিজের কথা ভাববে।

স্বাতী কিছু খেল না। না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। জয়ন্তর একবার মনে হল ডাকে, কিন্তু জিভটা যেন খাপেমোড়া। ঢাকা খুলে একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোর রাতে স্বাতী সেই ঝড়ের স্বপ্নটা আবার দেখল। সেবার যা দেখেছিল তার থেকে একটু আলাদা। ঝড়ে প্রথমে খড়কুটো পরে বাড়ির জানালা দরজা উড়ছে। হাঁ করা সব দেয়াল। বাসন আসবাব সবই উড়ে যায়। ঝড়ো বাতাস ওকেও উড়িয়ে নিয়ে যায় আর কী। ও কিন্তু সেবারের মতন ভয় পেল না, জয়ন্তকে জড়িয়েও ধরল না।

বাধা সোয়াধিনী ভেল।

১১

জলদ বরিষ ঘন দিবস অন্ধার। সকাল হলেও রোদ ফোটে নি। ভেজা কাক পাশের বাড়ির ছাতের কার্নিসে চুপটি করে বসে আছে। একলা।

স্বাতী ডাইনিং স্পেশে জয়ন্তকে দেখেও দেখল না। সোজা রান্না ঘরে ঢুকল। গোপালের মা'র চা করা হয়ে গিয়েছিল, কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। গোপালের মা বলে—রান্নাঘরে কেন? খাবার জায়গায় গিয়ে বস।

—না। এই ভাল। তুমি তোমার কাজ কর।

গোপালের মা চা দিয়ে এল জয়ন্তকে। এবার উনুন ধরাবে।

স্বাতী বলল—গোপালের ছাপাখানার কত দূর?

—মেশিন কেনা হয়েছে। রথের দিন খুলবে।

—দেখে আসব সেদিন।

গোপালের মা কৃতজ্ঞতার চোখে তাকাল—তোমাদের সাহায্য না পেলে কিছুই হত না।

স্বাতী চেষ্টা করেও গোপালের চাকরী করে দিতে পারে নি। চেষ্টা মানে জয়ন্তকে বলা। হচ্ছে হবে করে ক'মাস কেটে গেলে স্বাতী নিজের শ'পাঁচেক টাকা দেয়। বাকীটা মা-বেটার রোজগার।

গোপালের মা বিধবা হওয়ার পর জলে পড়েছিল ঠিকই কিন্তু ভেসে যায় নি; গেরস্থর বাড়ি দুখ মেহনত করে পেট চালিয়েছে। তখন বস্তির লোচন মিস্ত্রি হসিহসি পেমবচন কহলে গোপালের মা মাথা নেড়েছিল—না। গোপালের বাবা রাগ করবে।

এখন যদি গোপালের বাবা ফিরে আসে তবে আনন্দের সীমা

থাকবে না। বলবে—হরিদাসী, তুই যে এত ভাল তা আমি জানতাম না।

এমনি হয়। মানুষ বেঁচে থাকতে অনেক কিছুই জানতে পারে না।

স্বাতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলে জয়ন্ত মুখ তুলে তাকাল।

—তুমি আমার কথা একদম ভাব না।

—না ভাবলে উইদাউট পে ছুটি নিতাম না। নিজের কাজ ফেলে তোমার সেবা করতাম না।

—করে এখন আফসোস হচ্ছে তো?

গোপালের মা-র উপস্থিতি স্বাতীকে নিবৃত্ত করে। ও স্লিপারে আওয়াজ তুলে শোবার ঘরে ঢুকল।

জয়ন্ত চুপটি করে বসে থাকে।

*

গোপালের মা বাজার করতে গেল। যথারীতি বলে যায় উনুনে ভাত বসিয়েছে। জয়ন্ত যেন এর অপেক্ষাতেই ছিল, চেয়ার ঠেলে ওঠে।

—কী? আফসোস হচ্ছে কিনা বললে না তো?

—হচ্ছে। স্বাতীর গলা মৃদু কিন্তু থমথমে।

—এ আমি জানতাম। তি—ন সপ্তাহ। জোলো আটপৌরে জীবন। যাও অফিস যাও। টকঝাল দুপুরে ক্যান্টিনে। ছুটি হলে বৃন্দাবন রেস্তরাঁ।

—তারপর?

—তারপর সুখোষ্ণ কামরায় দুজনের পদাবলী কেত্তন।

—এসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করা উচিত।

—আমার বলতে লজ্জা করা উচিত। তোমার করতে নয়। কেন না দীপংকর কলির কেষ্ট। জয়ন্ত ব্যঙ্গের হাসি হাসল -কী যেন বল তুমি? লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ। ওরকম পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা গর্বের। তাই না?

—হাঁ।

—আমি যে ফার্স্ট ডিভিসনে খেলি এজন্যে গর্ব হয় না ?

—ফার্স্ট ডিভিসন! স্বাতী মুখ বিকৃতি করল—তুমি তো এক্সট্রা।

জয়ন্ত উত্তেজিত হল। বড় দুর্বল স্থানে স্বাতী আঘাত করেছে। এ নিয়ে বেচারা সর্বক্ষণ পুড়ছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। বলল—একদিন তোমার আমাকে নিয়ে কত গর্ব ছিল। মাঠে কত হৈ চৈ করেছ। বলতে গেলে এই খেলার জন্যেই ভালবাসা। আজ আমার খেলা গিয়েছে তাই ভালবাসাও গিয়েছে। ঠিক আছে, তুমি তোমার নিয়ে থাক আমি আমার নিয়ে থাকি।

ঘরে পা দিয়ে গোপালের মা চেঁচায়—বৌদি, ভাত যে পুড়ে যায়।

স্বাতী বলল—যাক। তুমি নীচ থেকে জন দুই মুটিয়া ডেকে আন।

—কেন ?

—আঃ! যা বলছি কর।

এরপর জয়ন্ত ও স্বাতীর মুখ ঘৃণায় কঠিন থাকা কালেই দু ঘরের আসবাব এদিক ওদিক হয়ে যায়। জোড় লাগানো সিঙ্গলবেডের একটা এঘরে একটা ওঘরে। সোফাসেটের বড়টা শোবার ঘরে রইল। এখন অবিশ্যি দুটোই শোবার ঘর। যেটা বসবার ঘর ছিল সেটা এখন জয়ন্তর। এ ঘরে একটা সিঙ্গল বেড, দুটো ছোট সোফা আর একটা আলমারি। এক ছাতের নীচে যে যার নিয়ে থাকার আয়োজন শেষ।

স্বাতী না নেয়ে না খেয়ে অফিস চলে গেল।

*

সাড়ে নটা বাজলেও জয়ন্তর দাড়ি কামানো শেষ হয় না। গলার কাছে সেফটি রেজর রেখে ভাবছে। ব্লেডটা কণ্ঠনালীর ওপর

চেপে ধরলে কেমন হয়? বুকের ভেতর কে যেন বলল: ফাউল, ফাউল। জয়ন্ত দাড়ি কামানো শেষ করে।

উঠে দাঁড়াতে একটা কটু গন্ধ পেল। নাকটা উঁচু করে ঘ্রাণ নেয়। স্বাতীর ঘর থেকে আসছে। পর্দা তুলে থমকে দাঁড়াল। আসবাবপত্র এলোমেলো। খাটের ওপর ডাঁই করা শাড়ী ব্লাউজ। দেয়ালের সেই জায়গাটা যেখানে আলমারি ছিল, ঝুলে ভর্তি। মেঝেয় টুকিটাকি কাগজ ছেঁড়া। জয়ন্তর নজর একটা ওলটানো ফটোগ্রাফের ওপর পড়ে। কার ছবি? সেই কটু গন্ধ আবার নাকে লাগল। তখন ভেতব ভেতর জয়ন্ত বনাম স্বাতী বনাম দীপংকর ট্রায়েঙ্গুলার ফাইট সুরু হয়ে যায়।

জয়ন্ত: লোচ্চা, আবার হাত বাড়িয়েছিস?

দীপংকর: আপনার বউ আপনি সামলান।

জয়ন্ত: স্বাতী! দীপংকরের সঙ্গে মেলামেলা করবে না।

স্বাতী: অসম্ভব।

জয়ন্ত: কেন?

স্বাতী: সম্ভব নয় বলেই অসম্ভব। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা জিনিস আছে।

দীপংকর: হা-হা-হা।

মাথার ভেতর টিপ টিপ করে। জয়ন্ত টলতে টলতে এগোয়। পা দিয়ে শট করতে মাউন্টেড ফটোগ্রাফ থেকে একজন ঝকঝকে দাঁতে হেসে উঠল।

সে কচি বয়েসের জয়ন্ত রায়।

জয়ন্ত নিজেকে চিনতে পারে না। অবাক হয়। বলে—কী খোকা? ট্রফি জিতে খুব যে দাঁত দেখানো হচ্ছে। পারলে নিজেকে মাঠে এসটাব্লিশ করতে?

মুখের হাসি ধরে রেখেই খোকা বলল—ট্রফি জিতে হাসি নি;

খেলে খুব স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছিল। আর এসটাব্লিশ করা? সে কেমন করে করব? আমার তেমন প্রতিভা ছিল না।

*

অফিসে জয়ন্ত ঝিম মেরে বসে থাকে। কতখানি প্রতিভা ওর ছিল? কতখানি প্রতিভা থাকলে একজন চুনী বা প্রদীপ হওয়া যায়? এ প্রশ্ন ও নিজেকে অনেকবার করেছে, আজ মনীশকে করল।

—মনীশ, কেন আমি কলকাতার মাঠে নিজেকে এসটাব্লিশ করতে পারছি না?

—সবাই কী পারে? পারে না। খবর নিয়ে দেখুন অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার হারিয়ে গেছে।

—কেন এমন হবে?

—জানি না। মনীশ মুখটা করুণ করল—তবে ব্যাপারটা ট্রাজিক। ক্ষুদ্র প্রতিভা অভিশাপের মত কাজ করে। জীবনের অনেক কেড়ে নেয় কিন্তু কিছুই দেয় না। শুধু রিক্ত করে। আমার বাবাকে করেছিল।

—তিনিও ফুটবলার ছিলেন?

—না। সেতারী। সঙ্গীত প্রতিভা তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছিল। তিনি দেহের সুখ মনের শান্তি হারিয়েছিলেন। টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তি—

—চুপ কর মনীশ। আর বলতে হবে না। জয়ন্ত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। টুপুসের দৃষ্টি এড়ায় না। উঠে আসে।

—কী হয়েছে, জয়ন্তদা?

—আমার মাথাটা কেমন করছে।

—বোধ হয় লো ব্লাড প্রেসার।

—হবে।

—ভাল করে খাওয়া দাওয়া করুন।

—করব।

—ছুটি নিন।

—নেব।

টুপুসের মনে হল, খেলা বাদ দিতে বলে কিন্তু বলল না। জানে ওকথা বললে জয়ন্তদা ব্যথা পাবে।

জয়ন্ত মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। না, পাখাটা স্পীডেই ঘুরছে, আর বাড়ানো যাবে না।

মনীশ একটা খাম তুলে ধরল।

—জয়ন্তদা, আপনার পার্সোন্যাল চিঠি।

—পার্সোন্যাল না বাইনেম?

—বাইনেম। মনীশ নিজেকে শুধরে নেয়—পার্সোন্যাল নয় অফিসিয়াল।

—দাও। মেমো টেমো হবে। ভাস্কর আমার নামে কমপ্লেন করবে বলেছিল। তাই বস হয়ত কৈফিয়ৎ চেয়েছে। জয়ন্ত খামের মুখ ছিড়ে চিঠিটা বের করল। পড়ছে, টুপুস বলল—কী?

—মেমো নয়। পে এরিয়ার পাচ্ছি।

—তাহলে তো সুখবর! টুপুস মুখটা উজ্জ্বল করে। মনীশ বলল—পাওনা টাকা দেরীতে পাওয়া জোর সুখবর।

*

লাঞ্চ ইন্টারভ্যালে জয়ন্ত তার সেকশন থেকে বেরুল।

এত বড় অফিসের ক্যান্টিন কিন্তু ব্যবস্থা ভাল নয়। নীচের তলায় সিমেণ্ট চত্বরে মেইন বিল্ডিং থেকে আলাদা করে তৈরী করা হয়েছে। অ্যাসবেস্টাসের ছাত। প্লাইউডের পাল্লায় স্প্রিং লাগানো দরজা। সেটা ঢুকতে বেরোতে ঝাপটে দিচ্ছে মেয়ে পুরুষ। জয়ন্তকেও দিল।

ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে স্টীলটিউবের রংচটা টেবিল চেয়ার। এক কোণে আলমারি, ক্যাসবাক্স ও কুপন বই নিয়ে ম্যানেজার বসে। মাথার ওপর ডিজেল ইঞ্জিন। ছবিটা জয়ন্ত নিরীক্ষণ করে।

একটা টিকটিকি আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। জয়ন্ত ম্যানেজারকে বলে—কী মোটা!

—হবে না? ক্যান্টিনে দেদার আরশোলা। ধরছে আর খাচ্ছে।

—দূর মশায়! জয়ন্ত মুখের একটা ভঙ্গী করল—খেলেই কী মোটা হয়? আপনিও তো দেদার লুচি মিষ্টি খাচ্ছেন তবু তাল পাতার সেপাই।

ম্যানেজার চটে গেল।

—আপনি আমার পার্সোন্যাল ব্যাপারে কথা বলতে পারেন না। ইট ইজ নান অফ য়ুওর বিজনেস।

—পার্সোন্যাল ব্যাপার?

—নিশ্চয়ই। খাওয়া, শোয়া, মেলামেশা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়?

জয়ন্ত'র বুকের ভেতর কথাগুলো ঘোরে। স্বাতী বলেছিল; আমি কার সাথে মেলামেশা করব আর কার সাথে করব না সেটা আমার রুচি নীতিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি এ নিয়ে অশান্তি করবে না। বলল—আমি দুঃখিত ম্যানেজারবাবু। একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলাম। ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।

এরকম আচরণ জয়ন্ত বড় একটা করে না। ভূতের মুখে রাম-নামের মত ঘটনা।

সে যাক। ম্যানেজার ঠাণ্ডা হল। বলে—ঠিক আছে। ঠিক আছে। কী খাবেন বলুন।

—শুধু এক কাপ চা। জয়ন্ত পয়সা দিল।

ক্যান্টিনে সব ক'টা টেবিল ভর্তি। আগে এমন হলে কেউ না কেউ উঠে দাঁড়াত। বসুন জয়ন্তদা। এখন সে দিন আর নেই। জয়ন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

পেছনের টেবিল ঘিরে ভাস্কর, বরুণ এরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একটা গলা মেয়েলি। সে তেলানো গলায় বলে—ভাস্করদা, আপনার পা খুলে গেছে। সোনালি শিবিরকে ক'টা গোল দেবেন ?

—দেখি। ভাস্কর কৃপার চোখে বরুণের দিকে তাকাল—কিরে, ছুটতে পারবি তো ?

—বড় হাঁপিয়ে পড়ি ভাস্করদা।

—তা চলবে না। পিনাকী সায়েব বলেছেন, ছুপয়েন্ট রেলের পাওয়া চাই। বাই হুক অর ক্রুক।

জয়ন্তর চোখে ঘেন্না ফুটে উঠল কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল না। প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে।

*

ছুটি হলে এক ছাতায় মনীশ আর টুপুস রাস্তায় পা দিল। বিয়ের পরও যে ওরা এক সেকশনে চাকরী করছে, তা শুধু জয়ন্তর জন্যে। মনীশ রহস্য করে বলেছিল—আপনি তো এখন ওর ভাসুর। এক পলক ভেবেছিল জয়ন্ত। তারপর চোখ কোঁচকায়—তুমি এখন আমার ভগিনীপতি। ইচ্ছে করলে শালা বলতে পার।

বৃষ্টি হচ্ছে তবে মুষল ধারায় নয়। টিপ টিপ। জয়ন্ত আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে গাড়ি-বারান্দায় আর দাঁড়াল না। দেরী করলে খারাপই হবে। হাঁটা দিল।

টুপুস ও মনীশ মন্থর গতি। এক ছাতার নীচে দুজন থাকলে যা হয়। জয়ন্ত গ্রেট ইস্টার্নের কাছাকাছি ওদের ছাড়িয়ে যায়। টুপুস চেঁচাল—জয়ন্তদা, ভিজছেন কেন ?

—ছাতা নেই।

—আমাদের তো রয়েছে।

—এক ছাতায় তিনজন ?

—তো কী হয়েছে ! যদি হয় সুজন—

জয়ন্ত পালাতে পারল না। এদিকে বৃষ্টির তোড় বাড়ছে। তিনজন গ্রেট ইস্টার্নের আর্কেডে আশ্রয় নিল। চোখের সামনে ইয়া লম্বা লাল শালুর ব্যানার। লেখাটা পড়া যায় না।

মনীশ ভূত দেখার মত বলে—ওরে বাবা!

—কী? জয়ন্ত একবার মনীশের একবার গেটকিপারের দিকে তাকায়।

মনীশ শুকনো গলায় বলে—লাল শালু।

—তো কী হয়েছে?

—রিডাকস্‌ন সেল নাকি?

টুপুস কুলকুল করে হেসে উঠল। হাসি থামলে বলে—ক'দিন আগে রিডাকসেনে শাড়ী কিনেছিলাম। দারুণ ঠকেছি। কাঁচা রঙ।

—দেখে শুনে নেবে তো। জয়ন্তর গলা।

—না। টুপুস আবদারের গলায় বলল—ও কথা তো মনীশ বলেছিল, আপনি বলবেন কেন?

জয়ন্তর বুকে মোচড় দেয়।

বৃষ্টির রাস্তায় ফিয়েট অ্যাসবাসাডারের অবাধ গতি। যখন চোখের জলের মত বড় বড় ফোঁটা আকাশ থেকে অবিরল পড়ছে তখন জয়ন্ত একটা ট্যাক্সি দেখে চমকে উঠল।

ব্যাক সীটে অন্তরঙ্গ হয়ে বসে রয়েছে বড় চেনা দুজন। স্বাতী ও দীপংকর।

১২

সোয়া পাঁচটার বিকেল হলেও এখনও এক আকাশ আলো। আষাঢ়ান্ত দিনের বেলা উর্বশীর যৌবনের মত, শেষ আর হয় না।

স্বাতী ও দীপংকর অফিস থেকে বেরিয়ে একজোট হয় তারপর ট্যাক্সিতে ওঠে। চেনাজানা এক উকিলের বাড়ি যাবে। ডিভোর্সের অনেক ঝামেলা।

স্বাতী বলে—বড় ক্লান্ত, দীপ।

—কেন? অফিসে খাটুনি বেশী? দীপংকর একপলক ভেবে বলল,—রাজেশ বুঝি একগাদা ডিকটেশন দেয়?

—না।

—তবে?

—টেনসন। স্বাতী ক্লান্তির চোখ খুলল—ডিভোর্স পেতে কত দিন লাগবে?

—যতদিন না ফাইন্যাল ডিক্রী পাওয়া যায়। তার জন্যে তুমি ভাবছ কেন? দেরী হলে জয়ন্ত ভুগবে।

—ওই ভুগবে? আমি ভুগব না? স্বাতীর গলার স্বরে কান্নার ছোঁয়া।

দীপংকর মুখ নামিয়ে একটু আদর করল স্বাতীকে। ড্রাইভারের আয়নায় তার ছবি উঠল। তিনি দেখলেন কিন্তু মহাপুরুষের ন্যায় নির্বিকার। হাতের স্টিয়ারিং মোচড় খেতে ট্যাক্সি ঘুরল।

ডাইনে মোহনবাগানের মাঠ। চোখে পড়তে স্বাতীর মন ভেসে যায়। নিজের কথা আর ভাবে না। বলল—মানুষটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

এই সংবাদে দীপংকর খুশী হলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ হতে

দিল না। অভিমানের গলায় বলে—আর আমি? আমার কথাটাও ভাব।

—তোমার আমার জয়ন্তর সকলের কথা ভেবেই বলছি, ডিভোর্স তাড়াতাড়ি হলেই ভাল।

—ভাল তো বুঝলাম। ডিভোর্স সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। উকিলের কাছে গেলেই জানতে পারবে।

ট্যাক্সি পার্ক স্ট্রীটে উঠতে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলেন, কত নম্বর? দীপংকর স্বাতীর মুখ দেখল। একপলক ভেবে বলে—সামনে বড় বাড়িটার পর।

—ওটা তো উকিলের বাড়ি নয়। স্বাতী চোখ চিরে তাকায়।

—নয়।

—তবে?

—খিদে পেয়েছে যে। দীপংকর মুখটা করুণ করল। গাড়ি থেকে নেমে আনমনা স্বাতীর হাত ধরে। একটু যেন টেনেই নামাল বান্ধবীকে। আর একটু হলে স্বাতী হুমড়ি খেয়ে পড়ত ওর ওপর।

বৃন্দাবন-এর পরিচিত কোণে বসল দুজন। চৌদিকে চারু আলো বেড়ি, রঙ্গিনী কত গাউনী। গায়িকা অঙ্গভঙ্গী করে পপ মিউজিক গায়। ব্যস্ত পায়ে বেয়ারা টেবিল থেকে টেবিলে ঘোরে। ফিস-ফিংগার মুখে দিয়ে দীপংকর বলল—সই। লিব ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাও।

—আমার ভয় করে।

—ভয়? কিসের ভয়?

—লিব মেয়েদের গো।······তোমার রীতার খবর কী?

—ওর খবর আর রাখি না।

—তোমার বসাকদার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ?

—হাঁ।···তা লিব মেয়েদের ভয় কর কেন?

—করব না ! ম্যানলি উয়োমেনদের ভয় করব না ?...আমার প্রেমের রুচি আলাদা।

দীপংকর নড়েচড়ে বসল। স্বাতীর রুচি ও ঠিক বুঝতে পারে না। রমার পেরেছিল। তার রুচি ছিল পাপপুণ্য ঘিরে। স্বামী ছাড়া আর কেউ চুমু খেলে পাপ। সে মরে গেলেও আর একজনের সঙ্গে প্রেম করতে পারত না কিন্তু স্বাতী পারে। তাই বলে স্বাতী মোটেই রীতা নয়। রীতার অনেক লাভার কিন্তু স্বাতীর শুধু একজন। স্বাতীর মধ্যে অনেকখানি রমা আর একটুখানি রীতা। এটা কেমন করে হয় ?

—সই !

—কী ?

—ওই যে তুমি প্রেমের রুচি বললে ওটা কী ?

—হাসালে।

বলে স্বাতী নিজেই হাসে। হাসি আর থামে না। মুখে রুমাল চাপা দিল। দীপংকর বলে—হাসির কথা নয়।

—তবে কী কান্নার ? একটু থেমে—তোমার তো অনেকগুলো ডিকসেনারি আছে। মানেটা দেখে নিও।

—ডিকসেনারিতে প্রেম আর রুচির আলাদা আলাদা মানে আছে।

—দুটো মানে জুড়ে দিও।

—তা না হয় দিলাম কিন্তু তাহলেই কী বোঝা যাবে ওটা কী ? কী ওর ভিত্তি ? মনের কোন্ বোধ ঘিরে ওটা গড়ে ওঠে ? দীপংকর কপালে ভাঁজ টাঁজ ফেলে দিল।

ফ্লোরে গায়িকা বদল হয়। কিঙ্কিনী কিনি কিনি রোলনী। কী যে বাজনার বোল মনে হয় নূপুর বাজছে।

স্বাতী চোখ সরু করে দীপংকরের দিকে তাকাল।

—তোমার কী হয়েছে বল তো ?

—বৃষ্টি বাদলার দিনে যা হয়। দীপংকর মুখটা উদাস করল—ভাবছি। পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে ?

*

আজ পূর্ণিমা তিথি, উচিত অভিসার। কে জানে সেজন্যেই হয়ত আজ রবিবার।

ময়দানে লেডিস গলফ ক্লাবের দিকে মেহগিনি কুঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে নাগর, ইতিউতি চায়। জল না জমলেও ঘাস ভিজে ভিজে। বসতে না পারায় দীপংকরের মুখ বিষণ্ণ। ট্রাম থেকে নেমে স্বাতী কুঞ্জের দিকে তাকাল। কানু হেরইতে ভেল বড় সাধ। দীপংকরের মুখের বিষণ্ণতা স্বাতীকে মুগ্ধ করে। ওর এরকমই পছন্দ। অধ্যাপক বাবার মুখে থাকত বিষণ্ণতা যা অবিশ্যি ইনটেলেকচুয়াল স্যাডনেস।

কুঞ্জের মাঝখানটা একটু উঁচু। সেখানে খবরের কাগজ পেতে স্বাতী বসেছে। আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি। মিষ্টি করে ডাকতে দীপংকর পাশে বসল।

আকাশে চাঁদ উঠল। দৃশ্য চরাচর ওয়াশ পেন্টিংয়ের মতন। স্বাতী মাথাটা দীপংকরের কাঁধে ঠেকাল।

—দীপ!

—বলো।

—ভুল সকলেই করে, আমিও করেছিলাম। মনে হয়েছিল ফুটবলারের বউ হওয়া খুব মজার। কিন্তু তা নয়। খেলা দেখতে যা গড়ে উঠেছিল তা খেলোয়াড় সামলাতে ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

—বিয়ের পর ?

—হাঁ।

—যাবেই।

—কেন ?

—বিয়ে মানে স্বামীর এসটাব্লিশমেন্ট। স্ত্রীকে সেটা মেনে নিতে হয়। না নিলেই ঝগড়া।

—তোমার ও রমার মধ্যে হত?

দীপংকর চুপ করে থাকে। সে কথা স্বাতীকে বলা চলে না। কাজেই যা নয় তাই বলে। বলল—না। কেন যে হয় নি?

—হয় না। স্বাতী জোর দিয়ে বলে—মিল থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় না। দাদা বৌদিকে দেখে তা বুঝেছি।

ক্যাস্যুরিনা এভন্যু বরাবর মোটরকারের হেডলাইট ও টেললাম্পের তুরঙের আলো দেখতে দেখতে দীপংকর ভাবে। শরীর উপোসী না রাখলেও তো একলা। একান্ত আপন করে না পেলে কী একলাভাব ঘোচে?... তার জন্যেই বিয়ে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের মধ্যে কোন ম্যাজিক নেই। ম্যাজিক হল পিরীতি।

দীপংকর প্রথাসিদ্ধ প্রেমিকের ন্যায় স্বাতীর চুলের ঘ্রাণ নিল, কপালে চোখে গালে ঠোঁট ঘষল, ঈষৎ খোলা ঠোঁটে চুম্বন করল।

স্বাতী গাঢ় গলায় বলে—আমাকে সারাজীবন এমনি ভালবাসবে তো গো?

—বাসব। তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।

—চণ্ডীদাসের একটা পদ গাও না?

দীপংকর গায়—এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি, পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।

গান শেষ হলে স্বাতী আচ্ছন্নের মত বসে থাকে। দীপংকর কানের কাছে মুখ আনল।

—সই।

—উঁ।

—ইচ্ছে করলে আমরা যে যার অবস্থানে থেকে পিরীত করতে পারি।

স্বাতী মাথা নাড়ল।

—নাগো।

—কেন সই ?

—সেটা আমার রুচিতে বাধে। আমি তোমার হয়ে তোমাকে ভালবাসতে চাই।

—সই! দীপংকর ভেবে ভেবে বলে—ভালবাসা এই ময়দানের বাতাসের মত অবাধ। বন্ধনের কথা ভাবছ কেন ?

—বন্ধনের যে দরকার। যেমন ঝিনুকের মধ্যে জল আটকা পড়ে মুক্তো হয় তেমনি বিয়ের বাঁধনে ভালবাসা।

দীপংকর আর কিছু বলল না।

দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতে খুলে যায়। ডাইনিং স্পেশে দাঁড়িয়ে স্বাতী দেখল জয়ন্তর ঘরে আলো জ্বলছে। দুপা এগিয়ে পরদার কাছে দাঁড়াল।

জয়ন্ত স্পোর্ট্‌স ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছিল, স্বাতীর পা দুখানি দেখতে পায়। বলে—কিছু বলবে নাকি ?

স্বাতী পরদা ঠেলে ঘরে এল। এখনও মনে অভিসারের ঘোর রয়েছে, কীভাবে সুরু করবে বুঝতে পারে না। আমতা আমতা করে বলল—বলছিলাম। আমরা তো—

জয়ন্ত মুখ তুলল—দাঁড়িয়ে আছে কেন ? বস।

স্বাতী দৃষ্টি জয়ন্তর চোখের ওপর রেখেই বসল—আমরা তো একরকম আলাদা হয়েই গেছি।

—নাতো। আমরা একসঙ্গেই আছি। এর নাম শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। জয়ন্ত সহ শব্দটার ওপর জোর দিল।

জয়ন্তর শীতল যুক্তি স্বাতীর ভাল লাগে না। ঈষৎ কঠিন গলায় বলল—এটা কী সুখের ?

—না। তুমি এটা চেয়েছিলে তাই। জয়ন্তর নিরুত্তাপ গলা—সুতরাং ধরে নিতে পারি তোমার কাছে দুঃখের নয়।

এমন সংলাপ স্বাতী অফিসে বসের সঙ্গে করে থাকে। যুক্তি-শীতল কথা বলতে এমন কিছু অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু ঘরে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতে ভাল লাগে না, বিশেষ করে এখন, ময়দান থেকে মুড়ে ফেরার পর। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলে—তা ধরে নিলে ভুলই হবে। কেননা অমরা এখন পরস্পরকে ভালবাসি না।

জয়ন্ত হারতে প্রস্তুত নয়। বলল—হয়তো কিছুদিন পরে বাসব।

—না। স্বাতীর বুক উত্তেজনায় ওঠানামা করে—আর আমি ভুল করব না। আমি ডিভোর্স চাই। মিউচিয়াল কনসেন্ট থাকলে মামলা টামলা করতে হয় না। আশাকরি, কনসেন্ট দেবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জয়ন্ত শান্ত গলায় বলে—মাথা গরম কোরো না। ভাল করে ভেবে দেখ। এমন কী হয়েছে যে আর মিটমাট হতে পারে না ?

—কী হয় নি ? ঝগড়া, কথাবন্ধ, এড়িয়ে চলা। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমাদের ধারনা ফাণ্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট। যেমন সাদা আর কালো। এ দুটোর কম্প্রোমাইজ হয় না।

—সাদা আর কালো! জয়ন্ত এবার স্বাতীর চোখে চোখ রাখল—সাদা কি কেবলই সাদা? কালো কী কেবলই কালো? মানুষের বেলায় তা হয় না। মানুষ মাত্রই রঙীন। চেষ্টা করলে আমাদের কম্প্রোমাইজ হতে পারে।

—না।

বলে স্বাতী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

*

রাত হলেও স্নান করা চাই। শাওয়ারের নীচে পিঠ রেখে স্বাতী দাঁড়াল। শিরদাঁড়া বেয়ে অস্থিরতা নেমে যায় আবার উঠে আসে। কিছুতেই শরীর ঠাণ্ডা হয় না।

জয়ন্ত যেন স্বাতীর অপেক্ষাই করছিল। ছিটকিনি খুলতে ঘর

থেকে বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলে বসল। রুটি তরকারী ঢাকা রয়েছে। দুটো প্লেট সাজিয়ে বলল—খাবে এস।

—পরে খাব।

—খিদে পায়নি?

—না।

—খেয়ে এসেছ?

স্বাতীর মাথার উত্তাপ পাঁচ ডিগ্রী সেলসাস বেড়ে গেল; বলে—খাচ্ছ খাও। আমার কৈফিয়ৎ চাওয়া কেন?

জয়ন্ত তরকারী মেখে রুটির টুকরো মুখে দিল।

স্বাতী ওর ঘরে এসে পাখা খুলে দিল। কী করি কী করি করে বৌদিকে চিঠি লিখতে বসে।…পুজোর সময় তোমাদের কাছে যাবার খুব ইচ্ছে। ছোটনকে নিয়ে বেশ কাটবে দিন। ফটো কে তুলেছে? দাদা না তুমি? ছোটন আস্তে আস্তে তোমার মতই দেখতে হচ্ছে। একথা আমি আগেই বলেছিলাম। ও কী তোমাকে এখনও লিপি বলে ডাকে না! মা বলতে শিখেছে?

কলম থামল। স্বাতী ওর বৌদির চিঠিটার ওপর চোখ বোলায়; দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

এক সময় স্বাতী খাম বন্ধ করে উঠল। খাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে নেই। আলুভাজা খেল, ঝোলের মাছটা খেল, রুটি তরকারী ছুঁল না!

আঁচিয়ে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ঘরের আলো যেমন জ্বলছিল জ্বলছে। স্বাতী যেন জানে, ঘুম আসবে না।

দু'ঘরের ইণ্টার কনেকটিং দরজা বন্ধ থাকলেও এক সরলরেখার ফাঁক থেকে যায়। সেটার জন্যে একঘরে আলো জ্বললে নিভলে আর এক ঘরের লোক বুঝতে পারে। জয়ন্ত ঘুমোয় নি কাজেই বুঝল, স্বাতী জেগে আছে।

১৩

কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ ছিল, আবার চালু হয়েছে। শরতের মেঘ বর্ষা শেষে রোয়াব নিচ্ছে খুব। মেঘৈঃ মেদুরম্ অম্বরম্। কখনও মেঘ কালো, কখনও মেঘ সাদা। যখন দুয়ের মেশামেশি তখন রংয়ের পরতে রং। ধূসর, পাটল, শ্যামবর্ণ।

আকাশের দিকে মুখ করে টুসি ব্যালকনির এককোণে বসে আছে। লিব ক্লাবে যায় না। হোমবার্ড এখন, বাচ্চা হবে। তার অস্তিত্ব টের পেতে মোনালিসা হাসি হাসল। য়ু নটি বেবী!

রাজেশ সুমুখ দিয়ে আসছে যাচ্ছে থমকে দাঁড়াচ্ছে মেঘও দেখছে। সহসা টুসির দিকে তাকাল।

—হোয়াট ওয়ার ইজ টু ম্যান, মেটারনিটি ইজ টু য়ুওম্যান।

— তোমার কথা?

—না। আমার মত লোক যুদ্ধের কথা বলতে যাবে কেন? ইতালীর এক যুদ্ধবাজ বলেছিল। আমি বললে ওয়ার না বলে বলতাম ইণ্ডাস্ট্রি। যে কোন শিল্প গড়ে তোলা সত্যিই পুরুষ মানুষের জীবনের সার্থকতা।

আকাশে মেঘ গুর গুর করে।

টুসি ভয় পাওয়া গলায় বলল—তোমার কী সেরকম কিছু করার ইচ্ছে আছে নাকি?

রাজেশ ওপর নীচে মাথা নাড়ল। আছে।

বৃষ্টি নামল। যাকে বলে বেড়ালে কুকুরে বৃষ্টি। বেশ চুপচাপ ছিল সব, কথা নেই বার্তা নেই ধুন্দুমার কাণ্ড। কী আওয়াজ! টুসিকে নিয়ে রাজেশ ভেতরে এল, দরজা বন্ধ করে দিল।

জানালার কাচে চোখ রেখে টুসি বলে—আজ আর তোমার

অফিস যাওয়া হয়েছে। রাস্তায় এক হাঁটু জল। গাড়ি বেরোবে না।

রাজেশ যথারীতি সাড়ে আটটাতেই রেডী হয়েছিল। যদি টুসির কাছে ঘোরাঘুরি না করে বেরিয়ে পড়ত তাহলে আর এই বিপত্তি হয় না। কাজের মানুষটি এখন ছটফট করে।

—কী শহররে বাবা! আধঘণ্টা বৃষ্টি হলেই ডেলিউজ।

—তা যখন হয়েইছে তখন আর স্যুটেড বুটেড কেন? পোশাক খুলে ফেল।

—তারপর?

—উই উইল গো টু বেড।

—সাড়ে নটার সকালে? রাজেশ প্রবল মাথা নাড়ে—সে আমি মরে গেলেও পারব না। তুমি শুয়ে পড়। টেপ চালিয়ে বর্ষার গান শোনো।

রাজেশ কিন্তু স্যুট বুট খুলে ফেলল। গায়ে গেঞ্জি আর পাজামা। টুসি আশার চোখে তাকাচ্ছে, রাজেশ স্লিপারে পা গলিয়ে বলে—যাই।

—কোথায়?

—অফিস। আমার এ সময়ের জায়গায়।

—কী করে যাবে?

—হেঁটে। রিকসায়।

—এই পোশাকে অফিস করবে?

রাজেশ সাইড ব্যাগ দেখাল। প্যাণ্ট সার্ট ওর মধ্যে আছে।

*

টুসি ডায়াল করে। লাস্ট ডিজিটের পর কোথায় কলড্ পার্টি জবাব করবে, তা না থট্। চারবারের বার রীতার গলা পেল।

—হ্যালো।

—আমি টুসি।

—ফুলটুসি ? হাউ য়ু ?

—ফাইন।

— কনফাইনমেণ্ট মানে বন্দীদশা ফাইন ? হোয়াট আ ফল মাই কান্ট্রি-য়ুওম্যান !

টুসি ঝরণার মত সুরধনী হাসল।

—তোমার খবর কী ?

—ভাল না।

—কেন ?

—অতীন ইজ ইন স্লুপ।

—কী হয়েছে ?

—সে তো টেলিফোনে বলা যাবে না।

—ও। টুসি অন্যমনস্ক গলায় বলে—এমন সব কাণ্ড ঘটছে ; সকাল বেলাতেই ডেলিউজ।

—ডেলিউজ ?

—হাঁ। হেভী শাওয়ার। চারদিকে জল। তোমাদের ওখানে বৃষ্টি হয়নি ?

—হয়েছে। তবে অত নয়।…হাবি অফিস গেছে ?

—গেঞ্জি পাজামা পরে বেরিয়েছে তো। কেন ?

—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

—ও।

টুসি রিসিভার নামিয়ে রাখল। রেখে আবার তোলে ডায়াল করে। অনেকবার ডায়াল করেও রাজেশের নাম্বার পেল না। মুখে মেঘের ছায়া নামে। লোকটা ভালোয় ভালোয় অফিস পৌঁছল তো ?

মনে দুশ্চিন্তা ঢুকলে টুসি সাঁইবাবাকে ডাকে। গলায় সোনার চেনে বাবার ছবি সম্বলিত লকেট। সেটা মাথায় ঠেকিয়ে ঠোঁট

নাড়ে। কৃপা করো, কৃপা করো, কৃপা করো। ভক্ত রমণীর মত দেখায় টুসিকে।

অমনি টেলিফোন বেজে উঠল। রাজেশ বলে—আসতে কোন অসুবিধে হয় নি। মাঝে মধ্যে এমন হাঁটাহাঁটি ভাল। খুব আনন্দের।

ফুলটুসি অবাক। কথাগুলো ঠিকঠাক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। নোংরাজলের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে ছু এক কিলোমিটার হাঁটা আনন্দের ?

রাজেশ সাড়াশব্দ না পেয়ে হ্যালো হ্যালো করে। তখন টুসি বলল—অফিসে আর কেউ এসেছে ?

—তোমার কী মনে হয় ?

—ছু চার জন পুরুষ আসতে পারে।

—আর মেয়ে ?

—ট্রাম বাস না চললে মেয়েরা কী করে আসবে ?

—কেন হেঁটে। আমার স্টেনো হেঁটেই এসেছে। এবং আমার চেয়ে দূর এলাকা থেকে। স্বাতী ইজ রিয়ালি ওয়াণ্ডারফুল।

টুসি এবারও অবাক হয় কিন্তু তার স্বাদটা ভিন্ন। সব অবাক হওয়া একজাতের নয়।

*

ছুপুরে রীতা এল। পরনে জীনস ও সার্ট, মাথার চুল আতেলা। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট রয়েছে। সোফায় ঘাড় লটকে বসল। টুসির দিকে না তাকিয়েই বলে—তোমার তো ন্যাপকিন বদলাবার সময় হয়ে এল।

—আরও তিন মাস।

—হা-হা।

—হাসছ কেন ?

—তোমার সেই রেজল্যুশন মনে পড়ছে। দশ মাস চলবে না। হা হা।

টুসিও হাসল। উন্নত স্তন কাঁপে।

রীতা সিগারেটে টান দিল। মুখ গোল করে ধোঁয়া ছাড়ে। রিংগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়। সে কিন্তু বাতাসে মিলিয়ে যাবার জন্যে।

টুসি বলল—তোমার কী শরীর খারাপ?

—না তো। শরীর ঠিক আছে।

—মুখ চোখ কেমন শুকনো। বেশী সিগারেট খেয়ো না।

—স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। অ্যাঁ?

—কথাটা কী মিথ্যে?

—জানি না। অভ্যেস হয়ে গেছে খাচ্ছি।

—ছাড়া যায় না?

—হয়তো যায় কিন্তু যা ভালো লাগে তা ছাড়ব কেন? রীতা শুকনো চোখ মেলে তাকাল—তবে ছাড়তে হতে পারে। হয়ত সিগারেট খাওয়ার পয়সা জুটবে না।

—কেন?

—অতীন মে বী সাসপেণ্ডেড্। হলে সাবসিসটেন্স পে পাবে। সে টাকায় মদ সিগারেট হবে না।

—বাট য়ু হ্যাভ আ লাভার। অ্যাণ্ড হী ইজ রিচ।

—সো হোয়াট?

রীতার চোখ দেখে টুসি চুপসে গেল। কিছু অন্যায় বলেছে? হাবির মতই তো লাভার। তার টাকা নেওয়া যায় না?

দুঃখের গলায় রীতা বলল—লাভারের সঙ্গে প্রেম করা চলে। হাত পাতলে তো বাবু হয়ে গেল। সে হয় না। আমাকে অন্য কিছু করতে হবে। ক্যাপিট্যাল থাকলে একটা বুটিক খুলতাম। তা যখন নেই তখন চাকরী। নিউ ইণ্ডিয়ায় একটা চাকরী হয় না?

—কী জানি। রাজেশকে জিজ্ঞেস করে দেখব। কী কাজ করবে?

—যে কোন কাজ। ক্লার্ক, টাইপিস্ট, রিসেপসনিস্ট। না হলে ড্রাইভার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। রীতা উঠে দাঁড়াল।

—চলি। আবার আসব।

—বস। বীয়ার খেয়ে যাও।

—থ্যাঙ্কস্।

রীতা ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

*

দিবানিদ্রা থেকে যখন টুসি উঠল তখন মিউজিক্যাল ডিং ডং শব্দে তিনটে বাজে। ওর ঘুম তেমন গাঢ় নয়, সামান্য শব্দেই ভাঙে। চোখ মেলে পুতুলের মত বসে রইল। পুতুলের মতই; কারণ টুসি তেমন ভাবতেও পারে না। যা হবার তা তো হবেই। ভেবে কী হবে? যদি করার কিছু থাকে তাহলেই মানুষ ভাবে। পুতুলের করার কিছু নেই তাই পুতুল ভাবে না।

আয়া যত্ন করে টুসির চুল আঁচড়ে মুখ মুছিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দিল। টুসি সকালের মত বিকেলেও ব্যালকনিতে বসে থাকে।

অনেক নীচে মানুষজন চলাফেরা করে। কেউ কাজে চলেছে, কেউ কাজ থেকে ফিরছে।

রাজেশ অফিস থেকে ট্যাক্সি করে ফিরল।

১৪

অফিসে যত কথা হয় তার সব অফিসিয়াল নয়, কিছু পার্সোন্যাল। কেননা অফিসে কাজ করা নরনারীর সঙ্গেই থাকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন।

ডিকটেশন দেওয়া শেষ হলে রাজেশ বলল—মিসেস রায়, আপনার কী হয়েছে আজ? বেশ কয়েকবার রিপিটিশন চাইলেন।

স্বাতী মুখ ঝুলিয়ে রাখে।

রাজেশ হিতাকাঙ্ক্ষীর চোখে তাকিয়ে রইল। স্বাতী যেন সেটা অনুভব করে মুখ তুলল—আপনাকে দীপংকর কিছু বলে নি?

—বলেছে। পারসোন্যাল ব্যাপার। রাজেশ দৃষ্টি গভীর করল—পারসোন্যাল আর অফিসিয়াল ব্যাপার আলাদা আবার আলাদা নয়। একজন ইয়ং লেডির দাম্পত্য জীবন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তিনি যদি দুঃখী হন অফিসের কাজ ভালভাবে করতে পারবেন না। সেটা অফিসিয়াল ব্যাপার। সুতরাং কিছু জানতে চাই। মে আই কোশ্চেন?

স্বাতী মাথা হেলিয়ে দিল।

রাজেশ প্রশ্ন করে—আপনি তো ভালবেসেই মিস্টার রায়কে বিয়ে করেছিলেন। তাই না?

—কী জানি! স্বাতী আকাশপাতাল ভাবার পর প্রতিপ্রশ্ন করে—একজনকে ভালবাসলে কী আর একজনকে ভালবাসা যায়?

—তার মানে?

—আমি দীপংকরকে ভালবাসতাম।

—তাই যদি, তবে মিস্টার রায়কে মনে নিলেন কেন?

—সে আমার অদৃষ্ট। দীপংকর ভবানীপুর ছেড়ে চলে গেলে

আমার মতিছন্ন হয়েছিল। ভেবেছিলাম, ফুটবলারের স্ত্রী হওয়া বড় মজার।

—আর ভালবাসা?

—মনে হয়েছিল ভালবাসা এমন কিছু নয়।

স্বাতীর চোখে জল এসে যায়। ও ত্বরায় স্ক্রীনের ওপাড়ে চলে গেল।

এপাড়ে রাজেশ দার্শনিকের মুখ করে পাইপ টানে। স্বাতী বলল—অদৃষ্ট। তা ঠিক। ম্যারেজ অ্যাণ্ড হ্যাঙ্গিং গো বাই ডেস্টিনি। অদৃষ্টের চালে বিয়েটা হল কিন্তু ভালবাসা? ওর আর টুসির মধ্যে কী হয়েছে ভালবাসা? যদি হয়ে থাকে তাহলে টুসিকে পেয়ে মন ভরে নি কেন? যদি না হয়ে থাকে টুসিকে নিয়ে দিন কাটছে কেমন করে? বেশ খানিকক্ষণ পাইপ টেনেও উত্তর বের করতে পারে না। তখন মনে মনে বলে: লভ ইজ আ পাজল্।

টাইপিং শেষ করে স্বাতী কপিগুলো ফাইলে রাখছে রাজেশ বলল—আমার মনে হয় আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন। ভালবাসা এমন কিছু নয়। আর এক কথা জীবন এমনিতেই যথেষ্ট জটিল, তা আর বাড়াবেন না।

*

রেল অফিসে এই সময় মনীশ তার সুপারভাইসারকে বলছে—জয়ন্তদা, ভালবাসাই হল সল্ট অফ লাইফ। ওটা যদি থাকে তাহলে জীবনের যে পদই হোক তা সুস্বাদু। আর যদি না থাকে শত মশলাতেও বিস্বাদ।

জয়ন্ত কিছু বলে না। মনীশের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। টুপুস বলে—সে তো নিশ্চয়। সব দেশে সব কালে সত্যি।...কিন্তু থাকে না যে।

—কেন থাকবে না? জয়ন্ত বলল—তোমাদের তো রয়েছে।

—বিয়ের জল শুকোতে দিন।

—তারপর কী ?

—তারপর শুক বলে, তুমি নিজেরটাই বোঝ আর সারী বলে, তুমিই বা কম কী ?

মনীশ পরিহাসের গলায় বলে—তাহলে জল শুকোবার আগেই কিছু করতে হয়।

টুপুস ঘাড় ঘুরিয়ে মনীশের দিকে তাকাল। কিছু মানে কী ? আত্মহত্যা ? যদি ও কোনদিন মনীশকে না ভালবাসে তাহলে কী মনীশ আত্মহত্যা করবে ? ভয়ে বেচারীর মুখ শুকিয়ে যায়।

জয়ন্তও খানিকটা ধন্দয় পড়েছে ; জিজ্ঞেস করল—কিছু মানে কী মনীশ ?

··আবার একটা বিয়ে। মনীশ শব্দ করে হাসল—সে বিয়ের জল শুকোবার উপক্রম হলে আবার একটা।

টুপুস হাতের চিঠিটা ট্যাগ করতে করতে মুখের একটা ভঙ্গী করল—ধর আর ছাড়। বড় মজা।

সেক্‌শনের এদিকটা প্রায় নিরিবিলি। দুদিকে দেওয়াল আর একদিকে আলমারির সারি। প্যাসেজ দিয়ে লোক যাওয়া আসা না করলে অন্তরঙ্গ কথা বলা যায়।

মনীশ প্যাসেজের দিকে চোখ রেখে বলল—জয়ন্তদা, ডিভোর্সের মামলা কী রুজু হয়েছে ?

—না।·· ও আমার কনসেণ্ট চায়।

—দেবেন ?

জয়ন্ত মাথা নাড়ল।

উভয় পক্ষের সম্মতি না থাকলে মামলা কঠিন। তখন বাদী-পক্ষকে টর্চার, এডালট্রি, ইমপোটেন্স এরকম কোন চার্জ আনতে হয়। তারপর সেটা প্রমাণ করতে সাক্ষীসাবুদ।

মনীশ জিজ্ঞেস করে—মামলা করলে বৌদি কী চার্জ আনবেন ?

প্যাসেজে রমণীমোহন বাবু হেলতে দুলতে এদিকে আসছেন

দেখে জয়ন্ত চুপ করে গেল। মনীশ একপশলা হেসে বলে—ব্যাগে কী?

—জানো না?

—টিফিন।

—সে তো এইটুকু একটা কৌটো।

—তাহলে কাগজপত্তর।

—পারলে না। রমণীমোহন তরমুজের বীচির মত দাঁত ছড়ালেন—কাগজপত্তর নয় জামাকাপড়। বাসায় রেখে এলে তোমার বৌদি পুরনো জিনিস কেনা লোকটাকে এগুলো দিয়ে কাপ ডিশ নেবেন। কত করে যে সংসার করছি।

রমণীমোহন বাবুর কথায় কিন্তু দুঃখের রেশ নেই।

*

দুপুর বেলা অফিসপাড়ার মেলাতলার চেহারা। এ বাড়ি ও বাড়ি প্রত্যেক বাড়ির সামনে জটলা। আর অলিগলিতে টক ঝাল, কতরকমের যে খাবার।

ভিড়ের মধ্যে একজন টাকমাথা ভদ্রমহিলা। তাঁকে দেখে কম বয়সী একটা মেয়ে হাসতে তার সীনিয়র বললেন—বয়স কালে তোমারও হবে।

—কক্ষণো না। বলে মেয়েটা কপালে হাত বোলায়। দেখছে, দুপাশের চুল কতখানি উঠেছে।'

হিন্দুস্থান মেশিনারীস-এর ক্যান্টিনে তেমন ভিড় নেই। দীপংকর কাউন্টারের সামনে পায়চারি করছে। মাথার ওপর চার্জশীটের খাঁড়া ঝুলছে, তবে ভোঁতা। ওর বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট চার্জ নেই। চার্জশীটে বলা হয়েছে: ইট ইজ নট ক্লিয়ার হোয়াই—। কেন তুমি প্ল্যানের বাড়ির চেয়ে বড় বাড়ি করেছ? কেন প্রপার্টি রিটার্নে বিভিন্ন ভ্যালুয়েশন দিয়েছ? কেন সোর্স অফ ইনকাম জানাও নি?

অভিযোগগুলোর মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর দীপংকর দিতে পেরেছে। তার কারণ, পারমিসন না নিয়ে বাড়ি করে নি, প্রপার্টি রিটার্নে বাড়ির কথা চেপে যায় নি আর রমার নামে ব্যাঙ্কের সেফটি ভল্টে দেড়লাখ টাকার গয়না ছিল। প্ল্যানের এদিক ওদিক করা বা ভ্যালুয়েশন কমানো এমন কোন অপরাধ নয়। বাকী রইল দেড় লাখ টাকার গয়না। সেটা দীপংকরের চাতুরী। সেফটি ভল্টে যে গয়নাগুলো ছিল সেগুলো কেমিক্যাল গোল্ডের, ভ্যালুয়েশন দেওয়া ছিল দেড়লাখ টাকা। আর বলা হয়েছিল, শ্বশুরের দেওয়া। ভেবে চিন্তেই কাজ করেছে তবু চিন্তিত। চার্জশীট বলে কথা। সেন-সিয়োর অথবা ইনক্রিমেণ্ট উইথহোল্ড, কিছু কী হবে না?

স্বাতী বুকের কাছ দাঁড়াল।

—কী এত ভাবছ?

—তোমার চেতাবনী। ঠিকই বলেছিলে, বসাককে কাট না দিলে এমন গাড্ডায় পড়তাম।

—চেতাবনী আমার নয়, রাজেশ সায়েবের। উনি আজও একটা দারুণ কথা বলেছেন।

—কী?

—বলব। স্বাতী ক্যান্টিনের ম্যানেজারের দিকে তাকাল—রাজভোগ চারটে। আর চা বিস্কিট।

খেতে বসে স্বাতী বলল—হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? রাজভোগ খাও।

—সইবে না।

—সেকী! রাজার পেটে রাজভোগ সইবে না?

—আমি রাজা নই।

—তোমার মাথায় একজন রাজা বসে রয়েছেন। রাজনীতি বেশ ভালই জানো। খেয়ে নাও।

দীপংকর হা হা করে হাসল। তারপর প্লেটটা স্বাতীর দিকে ঠেলে দিল—তুমি খেয়ে নাও।

—পাগল। স্বাতী উঠে দাঁড়াল—কী আনব ?

—কম চিনি দেওয়া কাঁচাগোল্লা। যা খাই।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দীপংকর বলল—রাজেশের দারুণ কথাটা কী ?

—জীবন এমনিতেই যথেষ্ট জটিল, তা আরও জটিল করা উচিত নয়।

—প্রসঙ্গ ?

—আমরা। স্বাতী সাড়ে এগারোটার সংলাপ আবৃত্তি করল।

দীপংকর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—কথাটা ঠিক ওরকম নয়। জটিলতা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কোথায় জটিলতা নেই ? তুমি এক কাজ কর।

—কী ? স্বাতী আগ্রহের চোখে তাকায়।

—আজ না হয় কাল তোমাদের আলাদা থাকতে হবে। মেয়েদের হোস্টেলে থাকো।

—হোস্টেল কেন ? তোমার বাড়িতেই তো থাকতে পারি।

—সেটা জুডিসিয়াল সেপারেশনের আইন মত হবে না। বোর্ডিং হাউস বা হোস্টেলেই ওঠ। নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের বোর্ডিংটা ভাল কিন্তু সব সময়ই হাউসফুল।

—তাহলে ?

—সে আমি ব্যবস্থা করব।

—আর ডিভোর্সের মামলা ?

—সেও হবে। ডিভোর্স তুমি পাবেই।

হঠাৎ স্বাতী ভয় পেয়ে যায়। জয়ন্তর সঙ্গে অন্তঃসার শূন্য সম্পর্ক জীইয়ে রাখতে এতটুকু আগ্রহ নেই, তবু। বুকের ভেতর কেমন একটা দুঃখ। এই দুঃখ ওর সত্তার গোপন।

দীপংকর বলল—আবার কী ভাবছ ?

—ভাবনার শেষ আছে ?

—তা নেই। এটা কিসের ভাবনা ?

—পিরীতির।

বলে স্বাতী ম্লান হাসল। বলতে পারল না : ভাবছি, আমার স্বামী সব জেনেও এত চুপচাপ কেন ?

*

নিউ ইণ্ডিয়া অফিস। সিঁড়ির মুখে স্বাতীর কী খেয়াল টাইপিং সেকশনে ঢুকল। এখনও লাঞ্চ ইন্টারভ্যাল শেষ হয় নি, মিনি কাজল সুলতা রেখাদি গোল হয়ে বসে গল্প করছে। স্বাতীকে দেখে রেখাদি বললেন—তাহলে ভোলনি আমাদের!

—তাই কী যায়। স্বাতী দুপা এগিয়ে রেখাদির মুখোমুখি বসল।

—কেমন আছেন ?

—ভাল। তুমি ?

—ভাল নেই।

—কেন ? কেন ? কাজল ও সুলতা দুদিক থেকে প্রশ্ন ছোঁড়ে—ম্যানেজারের স্টেনো ভাল নেই কেন ?

মিনি বলল—কী সুন্দর ঘর !

সুলতা গলা বাড়িয়ে মুখটা স্বাতীর কানের কাছে আনল—কী সুন্দর বর !

—বর ! কাজল ভুরু নাচায়।

—হবে তো ! সুলতা ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল।

রেখাদি চোখের কোণে স্বাতীর শুকনো মুখ দেখলেন। মায়া হল তাঁর। বললেন—ফাজলামি করে না। বলছে মন ভাল নেই। দুঃখটা শুনবে না কি ?

—ওটা আপনি শুনুন। সুলতা হেসে স্বাতীর চোখে চোখ রাখল—আমাদের কবে খাওয়াচ্ছ ?

—চাইনিজ ফুড। মিনি বলে—অ্যাণ্ড উইথ য়ুওর হ্যাণ্ডসাম লাভার।

—হাঁ। সুলতা মিনতির গলায় বলে—দীপংকরবাবুও আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

রেখাদি ওদের ভাগাবার জন্যে বললেন—ঠিক আছে বাবা। তোমরা এবার যাও।

সকলে বেরিয়ে গেলে স্বাতী বলল—অভ্র কোথায়?

—ছিল তো।

—ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—আচ্ছা। রেখাদি মায়াবী চোখে স্বাতীর দিকে তাকালেন—এবার বল, কী হয়েছে?

বলবে কী, সহসা জয়ন্তর কথা মনে পড়ে স্বাতীর আর ও কাঁদে। বুঝই না পারে ধনী পেমক রীত।

১৫

বিয়ের পর জয়ন্ত ও স্বাতী আসবাব, জানালা দরজার পরদা এসব জিনিস কিনেছিল। ঘর সাজানো টুকিটাকিও লাগে কিন্তু স্বাতী কেনে নি। জয়ন্ত যেসব ট্রফি জিতেছিল, তাই দিয়েই সাধ মিটে যায়।

সেগুলো কিছু দেওয়ালে কিছু পেলমেটের মাথায়। বিগত দিনের জয়ের প্রতীকগুলোয় ধূলো জমছে। বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে গোপালের মা-ও হাত দেয় না।

আটটার রাত। জয়ন্ত তার কামরায় বসে খবর শুনছে। অনেক কথাই কানে যাচ্ছে না। কষামাংসের গন্ধ পেতে বেরিয়ে এসে ডাইনিং স্পেসে দাঁড়াল।

বাইরের লোকজন কেউ খাবে নাকি গোপালের মা?

—খাবে বোধ হয়। বৌদি সাড়ে সাতশো মাংস রাঁধতে বলেছে।

—আর কী হবে?

—টমাটোর চাটনি। পরোটা।

—বাহ্!

বলে জয়ন্ত তার কামরায় ফিরে গেল। তখন খবর শেষ হয়েছে। জয়ন্ত ট্রানজিসটার বন্ধ করে সোনার মেডেলগুলো নামাল। তারপর অ্যালবামের পাতা ওলটায়। যত ছবি সব ওর আর স্বাতীর। বাচ্চা টাচ্চা না থাকায় কেমন যেন খালি খালি। জয়ন্ত মুখ কাঁচুমাচু করে। বাচ্চা হয়েও বাঁচল না। একবার নয় দুবার। কেন?

এ প্রশ্ন জয়ন্ত তার ডাক্তারবন্ধু বীতশোককে করেছিল। সে বলে: জেনেটিকস্। দুজনের অমিল থাকায় সন্তানের দেহ কোষে

ক্রোমোজম্‌ জোড় লাগছে না। তাই জরায়ুঘরে ভ্রূণ মাসে মাসে পুষ্ট হয়ে শিশুর আকার পেলেও অশক্ত, জন্মের পর লড়তে পারছে না।

এতদিন জয়ন্ত প্রত্যয় যায় নি। জেনোটিকস বিচার না করে এতজন বিয়ে করছে, তাদের সন্তান দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকছে। ওসব কিছু নয়। আজ ওর বিশ্বাস হয়। তখন মনে প্রশ্ন জাগে। আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি স্বাতীর বিয়ে হত দীপংকরের সঙ্গে, তাহলে?

*

স্বাতী প্রসাধন করবে কী করবে না ভাবছে। পরনে রুবিয়া ভয়েল গোলাপী ব্লাউজের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চিকনের গাঢ় লাল শাড়ী। দীর্ঘ বেণী নিতম্বের ওপর। আয়নার কাছ থেকে সরে এল। কান খাড়া করে শুনছে কলিং বেলের বেণুধ্বনি।

আওল নাগর। স্বাতী অনেক বলা কওয়ায় আজ দীপংকর এসেছে। গোপালের মা দরজা খুলে দিলে ভেতরে এসে দাঁড়াল। হাতে এঃ গুচ্ছ রজনীগন্ধা। বলে—স্বাতী কোথায়?

গোপালের মা আঙুল দিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। দীপংকর ভেতরে ঢুকল না। ডাইনিং টেবিলের ওপর ফুলের গোছা নামিয়ে ইতিউতি চায়। এই সেই নষ্টনীড়।

স্বাতী আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে এল। দীপংকরের জিজ্ঞাসা শুনতে পেয়েছে। আর শুনইতে নাম পেমে ভই ভোর। সলাজ হেসে ডাইনিং টেবিল ঘিরে রাখা চেয়ারের একটা দেখাল।

—বস।

—বসি। দীপংকর সশব্দে চেয়ার টেনে বসল—পাঁচবছর কাটল তোমার এই ফ্ল্যাটে। তাই না?

স্বাতী দাঁড়িয়েই আছে। আচ্ছন্ন ভাবটা এখনও কাটেনি। বলল—হাঁ।...চা খাবে?

—আবার চা কেন? জয়ন্তদাকে ডাক, খেতে বসি।

—আর দশ মিনিট। স্বাতী রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলে—ততক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প কর।

দীপংকর এক পলক স্বাতীকে খুঁটিয়ে দেখল। কাহিক রমণী কে তাহে জান। আকুল কয় গেলি হমর পরাণ। ভালবাসার রমণীকে খুশী করতে উঠল।

জয়ন্ত যেন অপেক্ষাই করছিল দীপংকরের। নির্লোম ভুরু কোঁচকায়—বস। তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

—জরুরী?

—তোর কাছে হয়ত নয় কিন্তু স্বাতীর কাছে তাই।

—তাহলে বলুন।

—বলছি। জয়ন্ত মুখ তুলে তাকাল—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বস। না বসলে কী কথা হয়?

দীপংকর বসলে জয়ন্ত ম্লান হাসল—আর আমার সেদিন নেই। খেলা ফুরিয়েছে।

—শুনলাম।

—কার কাছে? ভাস্করের?

দীপংকর চোখ সরু করে দেখছে জয়ন্তকে। অনুমানে বুঝতে চাইছে প্রতিপক্ষের মনোভাব। জয়ন্ত বলল—লজ্জা পাচ্ছিল কেন? দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন লভ অ্যাণ্ড ওয়ার। তোর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ও আমার নামে অনেক চুকলি কেটেছে।

দীপংকর ঘাবড়াবার পাত্র নয়। সে মোহন হেসে বলল—তা ঠিক নয়। ও আমার কাছে এসেছিল। সে যাক। আপনার তো এখনও ভাল ফর্ম আছে। খেলা ছাড়লেন কেন?

—এবার আমি মাঠ থেকে সরে আসতে চাই। জয়ন্ত গলা চড়াল—খেলা আমার অনেক নিয়েছে, আর না।

জয়ন্তর প্রবল ঘোষণা স্বাতী ও গোপালের মা রান্নাঘর থেকে

শুনতে পেল। গোপালের মা বলে—দাদাবাবু কেমন বদলে গেল এই ক'মাসে।

*

আলুভাজা, পরোটা, কষামাংস, টমাটোর চাটনি আর পুডিং। মিষ্টি দীপংকর তেমন পছন্দ করে না, তাই আনা হয় নি।

জয়ন্ত খেতে খেতে বলে—রান্না কেমন হয়েছে দীপংকর?

—ভাল।

—পুডিংটা তোর সই বানিয়েছে।

—হুঁ। দীপংকর চুপচাপ খায়।

স্বাতী একপলক জয়ন্তর দিকে তাকাল কিন্তু চোখে চোখ পড়ল না। জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে রেখেছে। ওভাবেই বলল—আমার হাঁটুতে বোন টি. বি. হয়েছিল। না সারিয়ে যদি পা'টা কেটে বাদ দিত, তাহলে কেমন হত বলতো, দীপংকর?

—অত্যন্ত খারাপ।

—কেন?

—কত বড় ক্ষতি।

—কী এমন ক্ষতি? একটা আরটিফিসিয়াল পা কিনে নিতাম, দিব্যি চলে যেত। স্বাতী ওর অফিসের রেখাদির মত আমার ভার নিত। সেটা লাভ না ক্ষতি?

দীপংকর ও স্বাতী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। মানুষটা আগের মত গোঁয়ার নেই, তুখোড় কথা বলতে শিখেছে। দীপংকর ট্যাকল করার মত বলল—রেখাদির স্বামীর পা কিন্তু খেলতে গিয়ে যায় নি। ভদ্রলোক স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়েই পা দিয়েছিলেন।

—তাহলে আমার পা গেলে স্বাতী আমার ভার নেবে না? জয়ন্ত মুখ তুলে স্বাতীর দিকে তাকাল—কী গো? নেবে না?

স্বাতী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর উঠে যায়। ওর আর কথা ভাল লাগে না।

জয়ন্ত হেসে দীপংকরকে বলল—স্বাতীকে ডাক।

—আপনি ডাকুন।

—আহা! পুডিং খাওয়া হল না। ডাক। তুই ডাকলেই আসবে।

দীপংকর ডাকল—স্বাতী!

—ভাল করে ডাক। যে নামে আদর করে ডাকিস। জয়ন্ত গুঁতো মেরে প্ররোচিত করে।

স্বাতী শোবার ঘরে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নত-মুখীর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল পড়ল। কী মোর কপালে লেখি। দীপংকরকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছি তা কী জয়ন্ত হতে দেবে না?

দীপংকর ডাকল—সই!

স্বাতী বেরিয়ে এল। গালে জলের দাগ সরের মতন। আড়চোখে একবার পতি একবার উপপতিকে দেখছে। কে কাছের আর কে দূরের?

দীপংকর বলল—খেয়ে নাও।

—আমার আর খেতে ভাল লাগছে না।

—তা কী হয়? জয়ন্ত প্রবল মাথা নাড়ে—তুমি না খেলে আমরাও খাব না।

অগত্যা স্বাতী খেতে বসল। তখন জয়ন্ত আর দীপংকরের মধ্যে কথা হয়।

জয়ন্ত: ফ্রেণ্ডশিপ মে অ্যাণ্ড অফন গ্রো ইনটু লভ। তা তোদের অবস্থাটা কী?

দীপংকর: সে তো আপনি জানেন।

জয়ন্ত: তবু তোর মুখে শুনি।

দীপংকর: আমি আর কী বলব?

জয়ন্ত: পাশ কাটাবি না। বলে ফেল। তোরা কী ঠিক করেছিস জেনে আমি ডিসিশন নেব।

দীপংকর ঃ মিউচুয়াল কনসেণ্টের ডিসিশন ?

জয়ন্ত ঃ হঁ্যা ।

স্বাতী দীপংকরকে এক পলক দেখল। চকিতহি চাহি বয়ান করু হেট। মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে বলে—বিবাহ বিচ্ছেদের পর আমরা বিয়ে করব।

জয়ন্ত শীতল চোখে দীপংকরের দিকে তাকাল।

—তুই কী বলিস ?

—আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।

— কেমন সে ভালবাসা ?

—তার মানে ?

—ভালবাসা তো একরকম নয়। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম—ভালবেসে বিয়ে করবি তো ?

দীপংকর মাথা হেলিয়ে দিলে স্বাতী আবেশে চোখ মুদল। তনু কাঁপই মদন উছল রে।

*

ছাতে বাল্ব বা টিউব নেই, আকাশের চাঁদই সম্বল। তা এখন ছাত চাঁদের আলোয় ফুট ফুট করছে।

স্বাতী ও দীপংকর খাওয়া দাওয়ার পর ছাতে এল। দীপংকর ডেকেছিল জয়ন্তকে কিন্তু ও আসেনি। বলে, আমার হাঁটুতে ব্যথা। সুতরাং বিজনে দুজন।

চাঁদের আলোয় স্বাতীর মন যেন ভাসছে। কোথাও কোন ভার নেই। কিশোরীর মতন লঘুপায়ে হাঁটছে, হাতের চুড়ি নাড়চাড়া করছে, আঙ্গুলের আংটিটা টানাটানি করছে।

দীপংকর সুর করে বলল—আজ পূর্ণিমা তিথি জানি মোয়ে ঐলিহু, উচিত তোহর অভিসার।

স্বাতীর বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে। ও এগিয়ে এসে দীপংকরের পাশে দাঁড়াল। লোচন চপল বদন সানন্দ। দীপংকরের

সম্ভোগ ইচ্ছাটা পাম্পের মুখে বেলুনের মত বড় হতে থাকে। ও. দুহাত দিয়ে স্বাতীকে বুকের কাছে টেনে নিল। স্বাতী আলিঙ্গনের ভেতরই কেঁপে উঠল।

—জয়ন্ত।

—কোথায় ?

—সিঁড়ির মুখে।

—ওতো ছায়া।

স্বাতী চোখ চিরে তাকায়। সত্যিই থামের ছায়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলল—এমন করে কেউ বাঁচে !

দীপংকর ভালবাসার রমণীর মুখের ওপর মুখ নামাল। আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলে স্বাতী বলে—সিঁড়ির দরজা খোলা রয়েছে।

—জয়ন্ত আসবে না।

—আসতে পারে ।

—দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দি।

—না।

—তবে অমায় ডাকলে কেন ?

স্বাতী নিরুত্তর রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেঁটে চলেছে নাক বরাবর চিলে কোঠার বিপরীত মুখে। চাঁদ ওদিকেই।

দীপংকর ডাকল—সই। একবার দুবার তিনবার। স্বাতী ফিরে তাকাল না, অবিচল পা ফেলছে। জলের ট্যাঙ্কগুলো পিছনে পড়ে রইল। স্বাতী অস্পষ্ট হতে দীপংকর ছুটে এল। দেখে, স্বাতী রেলিংয়ের ওপর বিপজ্জনক ভাবে বসেছে। পাগলের মত দীপংকর স্বাতীকে জড়িয়ে ধরল আর ওরা পড়ে যায় ছাতের ওপর। তখন শায়িত দুজনের দেহময় চাঁদের আলো। দেহ জ্যোতি শশীকিরণ সমাইতি, কে বিভিনারয় পার।

*

ভোর হয়েছে। অরুণ কিরণ কিছু অম্বর দেল। শেষমেষ চড়চড়ে রোদই স্বাতীর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বিছানায় উঠে বসল, আড়মোড়া ভাঙল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অবাক। ডাইনিং স্পেশে জয়ন্ত চুপচাপ বসে রয়েছে।

হালফিল জয়ন্ত ওর নিজের ঘরেই চা খায়, খবরের কাগজ পড়ে। ডাইনিং টেবিলে বসে অফিস বেরোবার মুখে ভাত খাবার সময়। সাড়ে সাতটায় এখানে বসে থাকা প্রায় অস্বাভাবিক। বলল—ছাতে এক চাঁদনীরাতে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার সবচেয়ে সুখী দিন কোনটা? মনে আছে সে কথা?

—আছে।

—কী বলেছিলে তুমি?

—যেদিন শরীরে ভালবাসার রক-এন রোল বাজনা শুনি।

—কাল রাতে সে বাজনা শুনেছ?

—এ কথা কেন?

—আছে, কারণ আছে। পৃথিবীতে যত কাজ আছে সব ফালতু আসল কাজ হল ভালবাসা। আমি চাই তুমি ভালবেসে সুখী হও।

—তার মানে, তুমি কনসেণ্ট দিচ্ছ?

—তাই। কাগজপত্র নিয়ে এস, আমি সই করে দিচ্ছি।

স্বাতী ত্বরায় নিয়ে এল কাগজের রোল। জয়ন্ত রবারের রিং টেনে রোল টেবিলের ওপর মেলে ধরল। সাদা কাগজে কালো কালিতে লেখা: দা হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৪…দা নিউ ম্যারেজ ল'জ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) ১৯৭৬…উই অ্যাপ্লাই জয়েণ্টলি ফর ডিভোর্স বাই মিউচিয়াল কনসেণ্ট…

জয়ন্ত এক পলক স্বাতীর মুখের দিকে তাকাল। কী যেন খুঁজছে রতিসুখসারে গতই অভিসারে স্ত্রীর মুখে। মাথা নাড়ল। না, সে বাজনা স্বাতী শোনে নি। জীবনে একবারই বাজে সে বাজনা। কলমটা খুলে খসখস করে সই করে দিল।

১৬

মাঘ মাস। দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার। যেদিকে যাওয়া যায় সেদিকেই হিমশীতল বাতাস। রোদে বসলেও স্বস্তি নেই। হিমকর কিরণ হিম অনিবার।

শীত ঠেকাতে দীপংকর গায়ে আলোয়ানটা ভাল করে জড়াল।

—ময়না।

—বাবু।

—কফি করে আন।

—এই তো চা খেলে।

—তো কী! শীত পড়েছে খুব।

দীপংকর প্রায় অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে রয়েছে। ভেতর থেকে বিবেক সওয়াল করে আর ও জবাব দেয়।

বিবেক: তুমি এমন হিপক্রিট কেন?

দীপংকর: কে নয়? শিল্পী, সাহিত্যিক, চাকুরে, ব্যবসায়ী, গরীব, বড়লোক—কে নয়?

বিবেক: প্রেমিক বাদ দিয়েছ?

দীপংকর: প্রেমিক আর রাজনীতিক জাত হিপক্রিট। কপটতা ছাড়া প্রেম আর রাজনীতি একদম জমে না। একথা সবাই জানে।

বিবেক: মিথ্যা কথা। প্রেম নিকষিত হেম। তুমি কীর্তনিয়ার ছেলে, একথা জান না?

ময়না আঁচল খসিয়ে বলল—এই নাও তোমার কফি।

—দে। দীপংকর আয়েস করে চুমুক দিল—এইখানে বোস।

—আমার কাজ নেই?

—পড়ে থাক কাজ।

—কেন? সকালবেলা আবার আমাকে কেন?

—একলা থাকলে এমন সব ব্যাপার ঘটে। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ তো বোস।

ময়না লীলাভরে বসল। আর কিছু না থাক, গতর আছে ময়নার। নিতম্ব জিনিয় গজকুম্ভা।

কফি শেষ হলে দীপংকর তার হাতের পাঁচ রমণীকে নজর করে।

—গালে কী হয়েছে রে?

—কিছু হয়নি তো! ময়না গালে হাত দেয়—এইটে?

—হাঁ।

—কিছু কামড়েছে।

—ক্রীম লাগাবি।

বলে দীপংকর কয়েক পলক ভাবল। তারপর নিজের কথায় আসে—হায়দরাবাদ চললুম, ময়না।

—বদলি হয়েছে?

—হয়নি। নিজেই চাইলাম।

—সে কী! বাড়িঘর পড়ে রইল, আমরা পড়ে রইলাম আর তুমি দক্ষিণ চললে। কেন?

—আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।

—ছ্যাখ বাবু, আমি তোমাকে হাড়ে মাংসে চিনি। কী হয়েছে বল?

—বললাম তো আমার এখানে ভাল লাগছে না।

ময়না বুঝেছে কিছু হয়েছে কিন্তু সেটা কী তা ওর নাগালের বাইরেই রয়ে গেল।

*

বড় রাস্তা থেকে মিতুল ছাখে, দীপংকর স্যুটেড বুটেড হয়ে ট্যাক্সি ধরছে। দেখে মিতুলের যে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না তা নয়। তবে মনটাকে নিজের বশে রাখে।

এ শিক্ষা মিতুলের জীবিকাই মিতুলকে দিয়েছে। দূরভাষিণীর গলাটি বড় মিষ্টি, তাই ও ট্রাঙ্ককল বুক করার সময় কোন রোমিও সাবস্ক্রাইবারের 'ইয়েস মাই হনি' এমন আদরের কথা অথবা মাউথ পিসের ওপর ঠোঁট দিয়ে চুমু খাওয়া এমন শৃঙ্গারের শব্দ শোনে। প্রথম যৌবনে মিতুলের শরীর শিরশির করত। এভাবেই সেই ভাব ভালবাসার ঘটনা যা মিতুলকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই এখন ও এমন সাবধানী।

দীপংকর ট্যাক্সির দরজা খুলে ডাকল—মিতুল।

মিতুল পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। আগ্রহ অনাগ্রহ কোনটাই নেই। সেই যে প্রথম যৌবনে প্রেমিকের হাতে চোট খেয়েছিল, তারপর পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধটা সহজ হয়ে গেছে। দীপংকরের মত রূপবান বিপত্নীক পুরুষ হাতছানি দিলেও বুকের রক্ত এঘর ওঘর করে না।

দীপংকর ঠোঁট ছড়াল—টেলিফোন ভবন যাবে তো?

—হাঁ।

—এস। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব।

— আপনার দেরী হয়ে যাবে।

—ন্‌না। দীপংকর উঠবার জন্যে ইঙ্গিত করল।

ট্যাক্সি মসৃণ গতিতে যাদবপুর ছাড়ালে দীপংকর হায়দরাবাদ যাওয়ার সংবাদটা দেয়। মিতুল চুপচাপ শোনে। সহজ সরল মুখ। চিন্ময়ীর ইচ্ছেটা জানা থাকলেও মিতুল তাঁর ছেলেকে বাঁধবার মত উচ্চাশা রাখে না। তার কথা ভাবে, যার দীপংকরকে নিয়ে ঘর বাঁধবার প্রবল আশা।

স্বাতী ও দীপংকরের প্রণয়কাহিনী মিতুল শুনেছে অভ্রকুমারের মুখে। ছেলেটা মিতুলের প্রতিবেশী আবার স্বাতীর সহকর্মী। দুজনের সঙ্গেই কথা হয়। অভ্রকুমারের কথায় মিতুলের মনে হয়েছে

দীপংকর মনে নিয়েছে স্বাতীকে। তাই বলল—হায়দরাবাদ একাই যাবেন ?

—হুঁ।

—খুব শীগ্‌গির ?

—হুঁ।

—শুনেছিলাম একজনের সঙ্গে ভাব ভালবাসা হয়েছে ?

—হুঁ।

দীপংকর তিনবার হুঁ দিলে মিতুল চুপ করে গেল। স্বাতীকে বিয়ে করার কী হল, জানার শত ইচ্ছা থাকলেও ভীরু মিতুল সেকথা সোজাসুজি দীপংকরকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

*

সোমবার অফিসে একটু বেশীই কাজকর্ম হয়, রবিবারের বিশ্রাম হয়ত এর কারণ।

হিন্দুস্থান মেশিনারীস্‌-এর চীফ অনেকগুলো ফাইল সারলেন। এখন তাঁর হাতে রয়েছে দীপংকরের পার্সোন্যাল ফাইল। তিনি বদলির অর্ডার সই করে দিলেন। কনফিডেন্সিয়াল রোল আপটুডেট করার পর ঠোঁট টিপলেন। একটি চিজ।

দীপংকর লাঞ্চ ইন্টারভ্যালের মুখে অর্ডারটা পেল। পেয়ে খুশীই হল। এখানে জল বড় ঘোলা। স্বাতী বিয়ে বিয়ে করে এমন পাগল যে, সামলানো দায়। সরে গেলে সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। মন, চলো হায়দরাবাদ।

দীপংকর টেলিফোনে স্বাতীকে সংবাদটা জানাল অন্য এক ভাষায়।

—সই! আজু মঝু দুর্দিন ভেলা।

—কেন? কী হয়েছে তোমার ?

—বিধি বাম। আমাকে হায়দরাবাদ ঠেলে দিয়েছে।

—বদলি ?

—নির্বাসন বলতে পার।

—কবে যাচ্ছ?

—টি. এ. অ্যাডভান্স পেলে। তিনচার দিন পর।

—এদিকের কী হবে?

—কী আবার! যেমন আছ তেমনি থাকবে। অফিস করবে, ঘরসংসার করবে, দিনান্তে আমাকে স্মরণ করবে।

স্বাতী থিতিয়ে গেল। বিরহ বেদনা যত তীব্রই হোক কোনরকম আদিখ্যেতা করে না। স্থির চোখে তাকিয়ে ভাবে। দীপ, তুমি যা বললে আমি তাই করব। অফিস করব, ঘরসংসার করব, তোমাকে মনে রাখব। সম্বিৎ ফিরে পেলে ভালবাসার কাঙালিনী বলল—আবার দেখা হবে তো!

*

রাতে স্বাতী আর একবার সেই ঝড়ের স্বপ্ন দেখল। পুরনো স্বপ্ন তাই খুব একটা অবাক হল না। বেশ নির্লিপ্ত চোখেই ছাখে, ভিক্টোরিয়ার পরী উড়তে উড়তে রাইটার্সের পরীদের কাছে এল, তারপর সকল পরী ডানা মেলে সুনীল আকাশে ওড়ে।

এদিকে মাটির ওপর স্বাতী কাজল মিনি সুলতা রেখাদি ঝড়ের মুখে বিপর্যস্ত। বাতাসের এমনই জোর যে কাজলের দীর্ঘ চিকুর বেগবান্ ঘোড়ার লেজের মত সোজা, মিনির স্কার্ট কথক নর্তকীর ঘাঘরার মত ফুলে উঠেছে, রেখাদির শাড়ীর আঁচল যেন লালকেল্লার মাথায় জাতীয় পতাকা। সহসা সুলতার শাড়ী উড়ে যায়, সায়াও বুঝি থাকে না।

ও চেঁচায়ঃ আমি কী করব? রেখাদি বললেন, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। কাজল তাই করল। সুলতা বলে, আমাদের ঘরই ভাল। ও বড়বাড়িটার দিকে দৌড়য়। স্বাতী মাটি ছাড়া হয়ে উঠতে থাকে। মিনি বলল: আই উইশ টু ফ্লাই। পরী বলল: য়ু কাণ্ট। একা স্বাতী পরীদের সঙ্গে উড়ে বেড়ায়।

১৭

নিউ ইণ্ডিয়ার বয়েস বেড়েছে আরও পাঁচ বছর। সেই সঙ্গে কোম্পানীর আয়, সুনাম, মূলধন, লোকজন এসবও। টাইপিং সেকশন বেড়ে দ্বিগুণ এখন। সেখানে নিবারণবাবু নেই কিন্তু বড়বাবু আছেন। এক রাজা যান অন্য রাজা আসেন। বড়বাবু এখন তাপস চক্রবর্তী। সিনিয়রিটি অনুযায়ী রেখাদিরই বড়বাবুর চেয়ার পাওনা কিন্তু তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যাঁর বড়বাবু হওয়ার কথা তিনি পড়ে রইলেন ঘরে আর উনি বড়বাবু হবেন? মিনি, কাজল রয়েছে কিন্তু সুলতা নেই। গত বছর ওর বিয়ে হয় মহিন্দর সিংয়ের সঙ্গে। ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাকটার, অনেক টাকা পয়সা। টাইপিস্ট মেয়েরা ভেবেছিল, সুলতার বিয়ে সহকর্মী শোভনের সঙ্গে হবে, কিন্তু তা হয়নি।

প্রোডাকশন ম্যানেজার রাজেশ আগের মতই মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। কাজ শুরু হয়েছে ফ্যাক্টরির থার্ড এক্সটেনসনের। লেটার অফ ইনটেন্টের জন্য লেখালেখির পর ফিনান্স কর্পোরেশনের টাকা পেতে ইল্লী দিল্লী করেছিল। এখন কনস্ট্রাকশনের কাজ নিয়ে পড়েছে। এদিকে রোজ একগাদা চিঠি আর একদল কন্ট্রাকটর আসে। রাজেশ জরুরী চিঠিগুলো স্থায়ী স্টেনো স্বাতীকে দেয় রেজিস্টারে এন্ট্রি করার পর ফাইলে পুট আপ করতে। তারপর ডিকটেশন দিচ্ছে, টেবিলের লাল টেলিফোন ট্যাঁ ট্যাঁ করে। ও ব্যস্ত হাতে তুলল—ইয়েস স্যার।

—প্লীজ কাম আপ। ম্যানেজিং ডাইরেকটার গলার স্বর গম্ভীর করেন—ইউনিয়ন লীডার হ্যাজ কাম।

—আ মিনিট। রাজেশ চেয়ার ঠেলে উঠল, কোটটা গায়ে দিল, ইউনিয়ন সংক্রান্ত ফাইলটা হাতে নিল।

ম্যানেজমেন্ট ও ইউনিয়ন মিটিংয়ে ঝাড়া তিনঘণ্টা আলোচনা করেও অটোমেশন সম্বন্ধে একমত হতে পারল না। সুতরাং রাজেশের মাথায় চিন্তা থেকেই যায়। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল।

*

টুসির এখন দুই মেয়ে। বড়টা চার বছরের আর ছোটটা চার মাসের। ইলি বিলিকে নিয়ে ও দিব্যি আছে, একদম বোরিং অনুভব করে না। মাঝে মাঝে শুধু মনে হয়, একটা যদি ছেলে হত।

রাজেশ স্নান করে ড্রিংকস্ নিয়ে বসলে টুসি সামান্য একটু জিন খেল। স্বামী স্ত্রীর দুচারটে গেরস্থালি কথা হয়। আটটা বাজতেই ডিনার। তখন বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে। টুসি ওদের দেখাশোনা করে রাজেশের বিছানায় এল।

—ঘুমোলে নাকি ?

—ডিউটি শেষ না হলে ঘুমোতে পারি !

—ডিউটি ?

—ইয়া। দা ডিউটি টু প্রোক্রিয়েট।

—মাই ডিয়ার রাজেশ—টুসি মুখটা রাজেশের কাছে আনল—প্রোক্রিয়েশন ইজ আ ম্যাটার অফ রিক্রিয়েশন অলসো।

রাজেশ ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। আর টুসি কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল। তিন সন্তানের জননী হলেও অটুট যৌবন। সুরত সমাপনে টুসি তার বিছানায় ফিরে গেল। বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে পারে না।

ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর টুসি সেই এক স্বপ্ন দ্যাখে যা গৌতমবুদ্ধ জননা দেখেছিলেন। টুসির বড় আশা, কোন এক মহাপুরুষের মা হবে। এজন্যেই লকেটে সাঁইবাবার ছবি।

*

অতীন এখন বেলুড়ে রয়েছে। নানা কারণে ও আর একটা

চাকরী পাচ্ছে না কী আর করবে, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের যে কটা টাকা পেয়েছিল তাই ফিকসড্ ডিপোজিট করেছে। সুদের টাকায় একটা পেট চলে যায়। বস্তিতে থাকে, নিজেই রান্নাবান্না করে। বিকেলবেলা রামকৃষ্ণ মিশনে যায়, ঠাকুরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। ঠাকুর, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করার শক্তি দাও।

রীতা লিব ক্লাবের বন্ধুদের ধরে সুবিধে করতে না পেরে বীতশোকের কাছে টাকা ধার করে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড অ্যামবাসাডার কেনে। গাড়িটা ভাড়া খাটায়। স্কুলের মেয়েদের বাড়ি থেকে নিয়ে যায় আবার ফিরিয়ে আনে। গাড়ি অবিশ্যি নিজেই চালায়।

স্কুলের ভ্যাকেশন থাকায় রীতার কাজ নেই। ক্লাবে সুইম করল কিছুক্ষণ তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে সিগারেট ধরাল। কী করা যায়? গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

বীতশোকের চেম্বার খোলা রয়েছে। রীতা উঁকি মারল—হাই! কী করছ?

—চিকিৎসা।

—কার? রীতা ইতিউতি তাকায়—ঘর তো ফাঁকা। রোগী কোথায়?

—এই তো! বীতশোক বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখাল।

রীতা চেয়ার টেনে বসল—কী হয়েছে তোমার?

—পেটে বাতাস ঢুকেছে।

—কী করে?

—রহমৎ ওমলেটের ডিম বড় বেশী ফেটায়। বীতশোক ঢেঁকুর তুলল—বাঁচলাম।

রীতা কুলকুল করে হাসল। হেসে জীন্‌সের পকেট থেকে খাম বের করে—এই নাও।

—ফিফটীন্‌থ্ ইনস্টলমেণ্ট?

—হাঁ।

—বাকী রইল পাঁচ ?

—হাঁ। রীতা কয়েক পলক ভেবে বলল—তখন আমি মুক্ত।

—অ্যাণ্ড য়ু ক্যান ম্যারি মী দেন।

—ইয়া।

*

যতীন কলোনীতে সানাই বাজছে।

চিন্ময়ী এখনও শরীরে মজবুত আছেন। অনেক খেটেছেন মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে। একাই একশ'। কোথায় কোথায় গেছেন, মেয়ে দেখতে এলে দেনা পাওনার কথা বলেছেন।

ভোজের কুটনো কুটতে বসলে ময়না শাক বেছে দেয়। বলে—দাদাবাবু সেই যে গেছে। আর এ ধার মাড়ায় না এক ধরনের মানুষ।

—হাঁ। প্রহ্লাদকুলে দৈত্য।

—দৈত্য দানব জানিনে মা। খুব ফিচেল।

—যার আচরণ ফিচেল, তাকে কী বলবি ? মানুষ না অমানুষ ?

ময়না অশিক্ষিত মেয়ে, চিন্ময়ীর কঠিন প্রশ্নের জবাব করতে পারে না। একবার মনে হয় মানুষ আর বার অমানুষ। শেষমেষ বলল—দোষেগুণে মানুষ।

—গুণের আবার কী দেখলি ? চিন্ময়ী খর চোখে তাকাল।

ময়না অস্বস্তি বোধ করে। ওর মত মেয়েকেও দাদাবাবু ভাল বেসেছিল, সেটা গুণ নয় ?

চিন্ময়ী যতক্ষণ কুটনো কুটলেন, ছেলের কথা ভাবলেন। একটা কথা তিনি বুঝতে পারেন না। দীপংকর জবরদখল জমিজায়গা করল, ফন্দি করে চাকরী জোটাল, ঘুষের টাকায় বাড়ি করল, অতীন বসাককে পথে বসাল। জয়ন্তর বউটাকে ভোগ করল, কিন্তু কিছুই তো হল না ! এ কেমন করে সম্ভব ?

মাথা ধরে চিন্ময়ীর। তিনি নিজের ঘরে তক্তপোশের ওপর শুলেন। মানুষের সমাজ অনেক বদলেছে কিন্তু সাদাকালোর ছবিটা রংয়ের দিক থেকে একই রকম। কালোই বারো আনা বরাবর।

বেলা গড়ায়। মিতুল নেমে এল চিন্ময়ীকে খাওয়াতে। অমনি চিন্ময়ী উঠে বসেন—তুমি? তুমি আজ চুপ করে বসে থাকবে।

—কেন?

—মেয়ের কথা শোন। চিন্ময়ী ম্লান হাসলেন—বিয়ের কনেকে তাই থাকতে হয়।

*

দীপংকর এখনও হায়দরাবাদে। প্রমোশন পেয়ে পাবলিক রিলেশন অফিসার। ও স্বাতীকে ভুললেও স্বাতী ওকে ভোলেনি। যুবতী চরিত বড় বিপরীত।

স্বাতীর কাছে জয়ন্তর সই-করা মিউচিয়াল কনসেণ্টের কাগজখানা অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। ও বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে গা করে নি। নিরুপমা বোর্ডিং-এ সীট পেয়েছিল, সেখানেও যায়নি। যেমন ছিল তেমনি আছে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে স্বাতী এখন ভালবাসা গভীরভাবে নিয়েছে। লোচনীরে করয় অভিষেক।

স্বাতী অফিসে যে বণ্ড সই করেছিল, তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। ও এখন ইচ্ছে করলে চাকরী ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু ছাড়ে না।—অভ্যেস হয়ে গেছে অফিস। সাড়ে নটা বাজলে পৌঁছে যায় সেই হলুদরাঙা বাড়ি।

আজ অফিস পৌঁছে স্বাতী অনেকগুলো ডিকটেশন দিল। শেষ হলে ওর চোখ ব্যথা করে। বাথরুমে গিয়ে চোখে জল দিল। আয়নায় তাকাতে দ্যাখে দুচারটে চুল পেকেছে।

লাঞ্চ ইণ্টারভ্যালে স্বাতী পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে টিফিন করতে বসল। অভ্রকুমার এখনও দোকান থেকে খাবার আনে। আজ

এনেছে মসালা দোসা। মিনি কাঁচালঙ্কা চিবিয়ে উঃ আঃ করছে। পুরো এক গ্লাস জল খেল। তারপর কথা হয়।

মিনি : সো হট !

কাজল : গরম কোথায় ?

মিনি : হট ফর দা চিলিস্।

স্বাতী : হট মানে গরম আবার ঝাল।

রেখাদি : কথার কত রকম মানে হয়।

কাজল : তাতো হয়ই। ভালবাসা মানে কেউ বলে সমঝোতা, কেউ বলে পাগলামি। ভালবাসা কারে কয় সই ?

স্বাতী চমকে উঠল। চোখে পড়তে মিনি বলে—স্যাটি, হোয়াট হ্যাপেনড্ অফ য়ুওর অ্যাফেয়ার ?

মিনি : ফ্রেণ্ডশিপ মে অ্যাণ্ড অফন গ্রো ইনটু লভ বাট লভ নেভার সাবসাইড্স্ ইনটু ফ্রেণ্ডশিপ।

স্বাতী : ইয়েস। উই আর স্টিল লাভার্স। বলে স্বাতী উঠে এল।

*

জয়ন্ত এখনও অফিস করে ফুটবল খেলে। ভেবেছিল সব ছেড়েছুড়ে ব্রজপুর চলে যাবে, চাষবাস দেখাশোনা করবে কিন্তু তা করেনি। করতে দেয়নি বীতশোক। বলেছিল ! কী হয়েছে তোর যে পালাবি এখান থেকে ? জয়ন্ত ভেবে দ্যাখে সত্যিই ওর কোন ক্ষতি হয়নি। বউ, চাকরী, ফুটবল সব ঠিকই আছে। একটু আলগা করে ধরলে কোন গোলমাল নেই।

সেকশনে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। মনীশ সিলেকশেন গ্রেড পেয়ে এস্টাবলিশমেণ্ট সেকশনের সুপার। টুপুস আছে তার জয়ন্তদার কাছেই। আশ্চর্য ! টুপুসের গালে এখনও বিয়ের জল চিকচিক করে।

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে টুপুসকে বলল—রেট লিস্টটা দাও তো।

—এই নিন। দেখবেন, কয়েকটা পাতা খোলা।

—ও ঠিক আছে।

—জয়ন্তদা, টুপুস কোমলগান্ধার স্বরে বলল—পাঁচ বছর তো হল!

—হাঁ।

—দীপংকর বাবু মনে হয় আর ফিরবেন না।

—হবে। জয়ন্ত রেট লিস্ট খুলে বিভিন্ন মালের দাম দ্যাখে আর এস্টিমেট চেক করে। দীপংকরের চিন্তা করে না।

টুপুসের কিন্তু দুশ্চিন্তা যায় না। জয়ন্তর এস্টিমেট চেক করা শেষ হলে বলল—বৌদি হায়দরাবাদ যাবার কথা বলেন না?

—শুনিনি তেমন কিছু।

টুপুস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাহলে বৌদি দীপংকরবাবুকে ভুলেছে।

*

পাঁচটায় অফিসের হাট ভাঙল। যেমন বরাবর ভাঙে তেমনি। বি-বা-দী বাগ ঘিরে মানুষ আর মানুষ। তারি মধ্যে জয়ন্ত ও স্বাতী। একই আস্তানায় ফিরছে, যেখানে এখন গোপালের মায়ের পরিবর্তে চারুশীলা বলে এক মহিলা কাজ করেন।

স্বাতী মিশন রোড থেকে বেরিয়ে লালদীঘির পাড়ে এল। পাতায় পাতায় হাওয়া কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়তে বুকটা কেমন করে। এই যে মেয়েরা ভালবাসা ভালবাসা বলে, তার কী জানে এরা? শুধু হাসি আর ছলনা? সে-কী শুধু আদর আর সোহাগ? সে কী শুধু কামনা আর বাসনা? স্বাতী মাথা নাড়ল। লাখ লাখ যুগ, হিয় হিয় রাখল, তইও হিয়া জুড়ল না গেল।

জয়ন্ত ওল্ড কোর্ট হাউস বরাবর হেঁটে ময়দানের দিকে চলেছে। ময়দানে এসে বিগত দিনের স্টার ফুটবলার এক বিচিত্র সুখ অনুভব করল। এই সুখ তুচ্ছ হওয়ার। ওর গায়ে কোন জার্সি নেই,

ওর মনে কোন ভয় নেই। যেখানে বাচ্চারা জামাকাপড় জড়ো করে গোলপোস্ট বানিয়ে খেলছে, জয়ন্ত সেদিকেই এগোয়।

একটা ফুটফুটে বাচ্চা ডাকল—জয়ন্তকাকু। ডাকার পর কচি পা দিয়ে বলটা কাকুর দিকে ঠেলে দিল। জয়ন্ত থমকে দাঁড়িয়ে বলটা ধরল, তারপর পা দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে গড়িয়ে ঘুরতে থাকে। প্রথমে ধীর, পরে দ্রুতগতি। বাচ্চা অবাক চোখে দেখছে। জয়ন্ত বলটাকে জুতোর ডগায় তুলে নাচাতে লাগল। একবার ডান পায়ে একবার বাঁ পায়ে। ফুটবল মাথায় ওঠে কাঁধে চড়ে। বাচ্চা জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরল—দারুণ, দারুণ। জয়ন্ত মাঠ কাঁপিয়ে হাসে।

———